‘আগরতলা মামলা’ শেখ মুজিব ও বাংলার বিদ্রোহ

ফয়েজ আহমেদ

‘আগরতলা মামলা, শেখ মুজিব
ও
বাংলার বিদ্রোহ

‘আগরতলা মামলা,

শেখ মুজিব ও

বাংলার বিদ্রোহ

ফয়েজ আহমদ

সাহিত্য প্রকাশ

উৎসর্গ

পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে বাঙালিদের

প্রথম বিদ্রোহ-প্রচেষ্টার উৎস

শহীদ লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন

পূর্বকথা

কোনো দেশের রাজনৈতিক বা সংগ্রাম-বিদ্রোহের ইতিহাস ধারার অসম্পূর্ণ প্রকাশ বাঞ্ছনীয় নয় এবং তার বিকৃতি অপরাধতুল্য। এই নাতিদীর্ঘ পুস্তকে আমাদের দেশের সংগ্রামের এক পর্যায়ে যে বিদ্রোহ প্রচেষ্টা হয়েছিলো, তার ইতিহাস লেখার চেষ্টা করা হয় নি; দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের ব্যাপকতার মধ্যে একটি উজ্জ্বল বিদ্রোহ-সংগ্রামের কাহিনীকে যথাসম্ভব সততার সাথে প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা হয়েছে। পঁচিশ বছর পূর্বের এই গৌরবের আনুপূর্বিক ঘটনাবলী সংশ্লিষ্ট কেউ লিখিতভাবে জনগণের কাছে তুলে ধরতে সক্ষম হলে দেশের জন্যে কল্যাণকর হতো। আমি তখন ঢাকার একটি দৈনিকের চিফ রিপোর্টাররূপে এই বিদ্রোহ-ঘটনা ও বিচার যেভাবে দেখেছি, তারই দৃষ্টিকোণ থেকে এই পুস্তক ।

কেবলমাত্র প্রজন্ম নয়, সে সময়ে যাঁরা যুবক বা প্রৌঢ় ছিলেন তাঁরাও অনেকে 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য' (সরকার অলিখিতভাবে রাজনৈতিক সুবিধার জন্যে প্রচার করেছিলেন বিভিন্ন পত্রিকায় 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে।) ঐতিহাসিক মামলা এবং জড়িত ব্যক্তিদের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ সংগ্রামী অবদান ও মামলার পরিণতি সম্পর্কে বহুলাংশে অপ্রচ্ছন্ন ধারণা বহন করছেন। তার ফলে আমাদের দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সশস্ত্র বিদ্রোহ প্রচেষ্টার কাহিনী ক্রমান্বয়ে আলোর বাইরে চলে যাচ্ছে। অথচ শাসকদের এই ষড়যন্ত্রমূলক মামলার সূত্র ধরেই ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুস্থান। তখনই শ্লোগান উঠেছিলো 'কারার প্রাচীর ভাঙব-শেখ মুজিবকে আনব'।

লেঃ কমান্ডার (নেভি) মোয়াজ্জেম হোসেনের নেতৃত্বে মামলা শুরু হওয়ার বারো বছর পূর্বে সামরিক বাহিনীর কতিপয় অফিসার ও কর্মী কর্মক্ষেত্রের বৈষম্য ও পূর্ব বাংলার ওপর নানা ধরনের নির্যাতনের প্রেক্ষিতে বিদ্রোহ করে ক্ষমতা দখলের (এই অঞ্চলের) পর স্বাধীনতা ঘোষণার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁরা পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক শক্তির সমর্থনের প্রচেষ্টা করেন। বিক্ষুব্ধ বাংলাদেশের বেশ কিছুসংখ্যক রাজনৈতিক নেতা গোপনে তাঁদের সমর্থনদানের আশ্বাসও দেন ।

বিদ্রোহী গ্রুপের ক'জনের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে সরকার শেখ মুজিবুর রহমানকে (তখনো তিনি 'বঙ্গবন্ধু' নামে পরিচিত ছিলেন না।) প্রধান অভিযুক্ত

ব্যক্তি করে 'বাংলাদেশ' স্বাধীন করার রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা বিশেষ ট্রাইবুনালে উপস্থিত করেন। এই মামলা আমাদের দেশের সশস্ত্র বিদ্রোহ প্রচেষ্টার প্রথম সরকারী স্বীকৃতি। সে কারণে এই মামলা আমাদের গৌরবের ইতিহাস ।

মামলার শুনানির প্রতিদিনের প্রতিবেদন ছাড়াও প্রত্যহ আমি তখন 'ট্রাইবুনাল কক্ষে' নামক একটি ক্ষুদ্র বিশেষ রিপোর্ট লিখতাম—যা' ছিলো মূল মামলার বাইরে সংশ্লিষ্ট ঘটনা এবং দুঃখ-বেদনা-আনন্দ, সাহসিকতা ও স্বাভাবিক মানবধর্মী বিষয়ক। পঁচিশ বছর পূর্বে দৈনিক 'আজাদ'-এ লেখা এই রিপোর্টের কোনো কপি আমার কাছে ছিলো না এবং আমি ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু সমাজে কিছু কিছু দেশপ্রেমিক সচেতন ব্যক্তি সর্বদাই কর্মচঞ্চল; তাঁদের মধ্যে 'সাহিত্যি প্রকাশ'-এর প্রধান ও সাহিত্যক মফিদুল হক অন্যতম। তিনি একদিন আকস্মিকভাবে আমাকে একটি প্যাকেট দিয়ে বললেন : সেই ঐতিহাসিক মামলাটি সম্পর্কে বই লিখুন, এই আপনার 'ট্রাইবুনাল কক্ষে'। তিনি বিভিন্ন লাইব্রেরি থেকে এই রিপোর্টগুলো সংগ্রহ করেছেন, একষাট্টটি। সংগ্রহের পূর্বে আমাকে কিছুই জানান নি ।

আমি বিস্মিত হলাম। তারই প্রচেষ্টার ফলে এই পুস্তক। কি ভাষায় তাঁকে ধন্যবাদ জানাবো! এতে যে কর্মেই হোক আমাদের দেশের সংগ্রাম-বিদ্রোহের একটি বিশেষ ইতিহাসের ঋত্বিকদের ও তাদের কর্মকাণ্ডের বৈভবের দিকগুলো ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে—কোনো পরিপূর্ণ ইতিহাস নয় ।

ফয়েজ আহমদ

জনগণের সাথে সম্পৃক্ত বা বিচ্ছিন্ন এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ বা গুরুত্বরহিত অথচ উল্লেখের দাবিদার এমন কোনো ঘটনার সাথে ইতিহাস বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না। সময় নেয়, নানা দৃষ্টিকোণে মধ্যে বিভিন্নতা দেখা দেয়, কিন্তু সত্যের উজ্জ্বলতা বিকাশ লাভ করতে বাধ্য । এই নির্মম ন্যায়নিষ্ঠ ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না। কোনো ঘটনা বা ব্যক্তির অবদানকে অস্বীকার করার চারিত্রিক শক্তিও তার নেই। সেই একই কারণে ইতিহাসের ধারায় ষাটের দশকে আমাদের দেশে রাজনৈতিক ঐতিহাসিক সশস্ত্র বিদ্রোহের মহিমান্বিত অবদানের কথা অস্বীকার করা যায় না। তাতে আপন বিদ্রোহের গৌরবকেই কেবল উপেক্ষা করা হয় ।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও একথা সত্যি যে, '৪৮-এর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সূচনা ও চার বছর পরে '৫২-তে রাষ্ট্রভাষার জন্য ছাত্র-জনতার রক্তদান থেকে শুরু করে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত যে সমস্ত ঐতিহাসিক আন্দোলন, বিদ্রোহ ও রক্তপাত ঘটেছে, তার ইতিহাস নানাভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। সেই সমস্ত গৌরবকে আমরা পতাকার মতোই ঊর্ধ্বে তুলে রাখি। কিন্তু ষাটের দশকের শেষের দিকে প্রধানত সেনাবাহিনীর বিভিন্ন অঙ্গে একটি জোটবদ্ধ দলের সশস্ত্র বিদ্রোহ প্রচেষ্টার কাহিনী আমাদের সংগ্রামী ইতিহাসেরই একটি উজ্জ্বল ঐতিহাসিক সত্য, সে কথাটি ক্রমান্বয়ে (হয়তো কারো কারো অবহেলায়) আমাদের গণবিদ্রোহ ও সংগ্রামের ইতিহাস থেকে উঠে যাচ্ছে। হতে পারে, মুক্তিযুদ্ধের মতো প্রচণ্ড ঐতিহাসিক ঘটনা ও তার বিজয় অথবা মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসের তাৎক্ষণিক আলোক প্রভাবেও সেই বিদ্রোহের ঐতিহাসিক গুরুত্ব উপলব্ধ হয় নি। হয়তো এই বিদ্রোহের বিষয়ে ব্যাপক রাজনৈতিক গোষ্ঠী ও জনগণকে প্রকাশ্যে অবহিত করানো হয় নি। সে কারণেএই গোপনীয় উদ্যোগকে বিদ্রোহ না বলে অনেকে ষড়যন্ত্র বলেন। একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, বিদ্রোহ বা ষড়যন্ত্র যা-ই হোক না কেন, সশস্ত্র বাহিনীর লোকদের উত্থান প্রচেষ্টার সূত্র ধরে অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তির নাম পাওয়া যায় এবং তাঁদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান । এই বিদ্রোহ মামলার প্রধান ও এক নম্বর অভিযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন তিনি। এই গৌরবোজ্জ্বল বিদ্রোহের ইতিহাসকে জাতীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অবহেলা করা হলে, আমরা আমাদেরই বীরত্বের গৌরবকেই উপেক্ষা করবো।

নৌ, বিমান ও পদাতিক বাহিনীর বেশ কিছুসংখ্যক তেজী বাঙালি দেশপ্রেমিক সৈনিক ও অফিসার ষাটের দশকব্যাপী, এমন কি তারও পূর্ব থেকে বাংলাদেশকে

স্বাধীন করার একটি রূপরেখা নিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে চলছিলেন। কিন্তু তাঁরা জানতেন, প্রধানত শেখ মুজিবুর রহমান ও মওলানা ভাসানীর মতো রাজনৈতিক ব্যক্তিদের কাছে এই আয়োজনের কথা প্রকাশ না করলে জনগণের সমর্থন লাভ করা সম্ভব হবে না। তাঁরা তাই প্রথমেই সরাসরি শেখ সাহেবের সাথে করাচিতে কয়েকবার যোগাযোগ করে তাঁকে পরিকল্পনার মূল বক্তব্য জানান এবং সমর্থন লাভের আশা প্রকাশ করেন। ন্যূনপক্ষে আটজন রাজনৈতিক ও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা এই বিদ্রোহের পরিকল্পনার সাথে জড়িত ছিলেন। এই বিদ্রোহকে এক পর্যায়ে জনগণের অংশ করে দিতে না পারলে বাঙালিবিরোধী পাকিস্তান সরকার অবশ্যই একে ষড়যন্ত্র বলে আখ্যায়িত করতে পারে এই আশঙ্কা তাঁদের ছিল। এই বিদ্রোহের মামলা থেকেই '৬৯ সালে অবিস্মরণীয় গণঅভ্যুত্থান ঘটে এবং তারপরেই '৭০ সালে পাকিস্তান সরকার নির্বাচন দিতে বাধ্য হয়। সেই মামলার সূত্র ধরে যে গণঅভ্যুত্থান ঘটেছিল তা কেবল '৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে এক অবিশ্বাস্য বিজয়ের পথেই নিয়ে যায় নি বরং সকল শ্রেণীর রাজনৈতিক চিন্তাচেতনার মানুষকেও একটি চূড়ান্ত পথের মুখে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়েছিল। এই গৌরবের ইতিহাসটি এখনো হয়তো কোনো অবহেলায় উল্লেখ না করে বর্তমান প্রজন্মের সন্তানদের কাছে বলা হয় ঊনসত্তরে গণঅভ্যুত্থান ঘটেছিল। কেন সেই অভ্যুত্থান এবং কি সূত্র ধরে কিভাবে ঘটেছিল সেই কথাগুলো ঐতিহাসিক সূত্রে গ্রথিত করে তাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হচ্ছে না।

মুক্তিযুদ্ধের ওপর যত সত্য-নির্ভর পুস্তক রচনা করা বাঞ্ছনীয় ছিল, তা এখনো হয় নি, একথা সত্য, কিন্তু অনেক মিথ্যার আশ্রয়, বানানো কাহিনী এবং অপরের কাহিনী অবলম্বন করে নতুন নতুন পুস্তক বেরুচ্ছে। তার ফলে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সত্য উদ্ঘাটিত হচ্ছে না। এমন কি উল্লিখিত মামলাটির উল্লেখ বা তার ওপর ঐতিহাসিক গুরুত্বারোপ দৃষ্টিগোচর হয় না । ঐতিহাসিকগণ বা অনৈতিহাসিক লেখকদের প্রায় পঁচিশ বছর আগেকার এই বিদ্রোহের ঘটনা উল্লেখ না করার কারণ রাজনৈতিক অথবা তখনকার দিনে বয়সের স্বল্পতার দরুন বর্তমান অনেক লেখকের অভিজ্ঞতার অভাব। শুধু তাই নয়, এদেশে একটি দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এ. কে. ফজলুল হক, শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান—যাঁরা এদেশে গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল আন্দোলনকে স্ব-স্ব প্রেক্ষিতে অগ্রগামী করেছিলেন, তাঁরা কেউ রাজনৈতিক আত্মজীবনী লিখে যান নি। সোহরাওয়ার্দীর নামে যে পুস্তকটি

বেরিয়েছে তা কেবল একটি দৃষ্টিকোণ ও প্রেক্ষিত থেকে এবং বিরুদ্ধ পক্ষের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তাঁর আর্তনাদ। এই যে জীবনী বা আত্মজীবনী বা স্মৃতিকথা লেখার অনভ্যাস বা রাজনৈতিক কর্তব্য পালন সম্পর্কে তাঁদের অবহেলা, তা আমাদের জাতিকে অনেক সত্য ইতিহাস থেকে বঞ্চিত করেছে। ষাটের দশকে সশস্ত্র বিদ্রোহের কাহিনীর সত্য উদ্ঘাটন ও তার সম্পর্কিত রচনার প্রতি অবহেলাও কিছুটা রাজনৈতিক এবং সাধারণভাবে উক্ত একই কারণে বর্তমান প্রজন্মের অজ্ঞতা। আমাদের সংগ্রামের ইতিহাসে এই বিদ্রোহের আয়োজন সংযুক্ত না হলে ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকবে এবং বীরত্বের গৌরবজনক কাহিনী উপেক্ষিত হবে। মনে রাখতে হবে ষাটের দশকের মধ্যভাগের ছয় দফার প্রচণ্ড আন্দোলন জনগণকে উত্তপ্ত করে রাখছিল।

১৯৬৮ সালের ২১ এপ্রিল এক নোটিফিকেশনে স্পেশাল ট্রাইবুনাল অর্ডিনেন্স অনুযায়ী বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করে পাকিস্তান সরকার যে বিচারের ব্যবস্থা করেছিলেন, তা ছিল সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং তথাকথিত আইন ও বিচারের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের অসন্তোষ ও উত্তাপকে চিরতরে প্রশমিত করার আয়োজন। অভিযুক্তদের মধ্যে কয়েকজনকে উত্থাপিত রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে প্রাণদণ্ডদানের ষড়যন্ত্র ছিল এই মামলায়। আর সেই ষড়যন্ত্রের প্রধান শিকার ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান ও লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন। তাঁদের বা প্রয়োজনে অন্যদের ফাঁসি নিশ্চিত করার জন্য সরকার দুশোজন সরকার পক্ষের সাক্ষীর নাম মামলার প্রথমদিনই মুদ্রিতভাবে প্রকাশ করেছিলেন। এই মামলায় অভিযুক্তদের ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সাথে সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা দেখিয়ে প্রথম চিন্তায় ভারতকে জড়িত করতে চেয়েছিলেন এবং সেইভাবে মামলার নামকরণ করারও আয়োজন করা হয়েছিল বলে জানা যায়। কিন্তু সর্বশেষ চিন্তায় সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ ভারতকে সরাসরি মামলায় জড়ানোর আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার ভয়ে অন্য একটি নাম বেছে নেন। কিন্তু তবুও অভিযুক্তদের সাথে যে ভারতের সম্পর্ক রয়েছে সেই কথাটি দেশবাসীর কাছে প্রচারের জন্য মামলার প্রকৃত নামের বাইরে আরেকটি নাম চালু করা হয়। বিশেষ ট্রাইবুনালে উথাপিত মামলাটির প্রকৃত নাম হচ্ছে 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য'।

পঁয়ত্রিশজনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল বিচ্ছিন্ন করে 'বাংলাদেশ' নামক পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অভিযোগ আনা হয়। পাকিস্তান

সরকার বিদ্রোহীদের উচ্ছেদ করার প্রয়াসে এমনই উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল যে, ‘বাংলাদেশ' শব্দটি তারা স্বাধীনতার সাথে অভিযোগের মাধ্যমে যুক্ত করেন। কিন্তু অভিযুক্তগণ ভারতের সাথে ষড়যন্ত্র করে তাঁদের উল্লিখিত বাংলাদেশ স্বাধীন করার চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ উথাপিত হলে ভারত-বিরোধী সাধারণ মানুষের উষ্ণ সমর্থন পাওয়া যাবে এই প্রত্যাশা তাঁদের মনের মধ্যে ছিল। সেই কারণে সুকৌশলে প্রচার অভিযানে মামলার প্রকৃত নাম উড়িয়ে দিয়ে ‘আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামটি ব্যাপকভাবে প্রচার ও উল্লেখ শুরু হয়। সামরিক বাহিনীর জনসংযোগের জনৈক মেজর নাসের মামলা উত্থাপনের প্রথমদিনই ঢাকাসহ পাকিস্তানের বিভিন্ন পত্রিকা ও সংশ্লিষ্ট রিপোর্টারদের কাছে মামলাটির নাম উদ্দেশ্যমূলকভাবে ‘আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' বলে উল্লেখ করেন এবং আস্থাভাজন সাংবাদিকদের কাছ থেকে সহজেই তিনি এই মিথ্যা নামকরণটি প্রচারে সাফল্যলাভ করেন। কুর্মিটোলার সেনানিবাসের অভ্যন্তরে বিচ্ছিন্নভাবে অভিযুক্তদের রাখা হয়েছিল এবং তারই মধ্যে একটি বিশেষ বাংলোর কক্ষে ‘বিশেষ ট্রাইবুনালে'র অধিবেশনের কাজ শুরু হয় । অভিযুক্তগণ তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত ‘ষড়যন্ত্র' শব্দটি মেনে নিতে রাজি হন নি; বরং তাঁরা ‘বিদ্রোহ' শব্দটিকে গৌরবজনক ও গ্রহণজনক মনে করতেন।

ট্রাইবুনালের বাইরে পত্রপত্রিকায় ও প্রচারণায় ভারতকে পরোক্ষভাবে জড়িতকরণ ও মামলার নাম পাল্টে দেয়ার চেষ্টা অব্যাহত ছিল। দীর্ঘ অভিযোগপত্রের ছিয়াশি নম্বর অনুচ্ছেদে ১৯৬৭ সালের ১২ জুলাই আগরতলায় ভারতীয় কর্মকর্তাদের সাথে দু'জন অভিযুক্ত ব্যক্তির তথাকথিত গোপন বৈঠকের কথা উল্লেখ করা হয়। কিন্তু উননব্বই অনুচ্ছেদের শেষ লাইনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, ‘ভারতীয় কর্মকর্তাগণ উক্ত বৈঠকে প্রতিনিধিদের (অভিযুক্ত) যোগ্যতার গুরুত্বের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি।' অর্থাৎ সরকার মামলার নাম থেকে ভারতকে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার ভয়ে প্রত্যাহার করলেও আগরতলা বা ভারতকে পরোক্ষভাবে জড়িত করেছে অথচ গুরুত্ব দেয়ার ব্যাপারে অনেকটা উদাসীন ছিল। সাধারণ মানুষের কাছে ভারতের জড়িত থাকার ব্যাপারটি উল্লেখই ছিল তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। সে কারণে তারা আগরতলার নাম উল্লেখ করে পত্রপত্রিকায় মামলাটিকে ‘আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' বলে চিহ্নিত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত ছিল। মামলাটির এই কাল্পনিক নামকরণের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ যে সফল হন নি, তা নয়। শুধু প্রজন্ম নয়, অনেকেই এখন জানেন যে, এই মামলটি ছিল ‘আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা', যা একান্তই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও

শয়তানের মিথ্যা বাক্যের সমতুল্য।

বাংলাদেশ রাষ্ট্র নামক একটি পৃথক ও স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার গুরুতর অভিযোগ সম্বলিত ‘রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য' নামে মামলা দায়ের করার আগে ১৯৬৭ সালের ৯ ডিসেম্বর থেকে কোনো প্রচার না করে গোপনে প্রথম দেশব্যাপী গ্রেফতার শুরু হয়। সংশ্লিষ্টদের ধারণা, পরবর্তী বছরের মাঝামাঝি পর্যন্ত নৌ, সেনা, বিমান বাহিনী, রাজনৈতিক ও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাসহ বাংলাদেশের মোট দেড় হাজার নাগরিককে প্রাথমিকভাবে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন ঢাকা সেনানিবাসে অতি সতর্কতামূলক ব্যবস্থার মধ্যে সুরক্ষিত একটি ক্ষুদ্র বাংলোতে উক্ত মামলাটি শুরু হয়। তিন সদস্যবিশিষ্ট ট্রাইবুনালে প্রধান বিচারপতি ছিলেন বিচারপতি এস. এ. রহমান এবং অপর দু'জন সদস্য ছিলেন এম. আর. খান ও মুসসুমুল হাকিম। এরা দু'জনই বাঙালি ।

বিচারপতি হাকিমকে মুক্তিযুদ্ধের পর স্বাধীনতা লাভের সাথে সাথে বঙ্গভবন ও গণভবনে সস্ত্রীক নিয়মিত আনাগোনা করতে দেখা যায়। আকস্মিকভাবে একদিন সরকার সবাইকে অবাক করে ব্রাজিলে তাঁকে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করেন। বিচারপতি হাকিমের নিয়োগ শেখ সাহেবকেও যে সন্তুষ্ট করেছিল তা নয়, তিনি বিভাগপূর্ব কালে কোলকাতার বেকার হোস্টেলে বন্ধুত্বের পীড়নের জোর তদ্বিরের তাড়নায় শেষ পর্যন্ত একটি নিষ্প্রয়োজনীয় স্থানে বিচারপতি হাকিমকে রাষ্ট্রদূত করেছিলেন। বর্তমানে তিনি বি.এন.পি'র সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। ট্রাইবুনালে অভিযুক্তদের পক্ষে সর্বমোট ছাব্বিশজন কৌসুলি নিযুক্ত ছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমানের প্রধান কৌসুলি ছিলেন অ্যাডভোকেট আবদুস সালাম খান এবং একটি সেশনের জন্য শেখ সাহেবের পক্ষে ইংল্যান্ড থেকে প্রখ্যাত কৌসুলি টমাস উইলিয়ামসকে (কিউ. সি) আনা হয়েছিল। উইলিয়ামসকে সহযোগিতা করেছিলেন ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম ও ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ ।

দেশের অতি বিশিষ্ট দু'জন বৃদ্ধ আইনজীবী খান বাহাদুর মোহাম্মদ ইসমাইল প্রাক্তন সি.এস.পি রুহুল কুদ্দুসের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁকে সাহায্য করেন বর্তমানে এ্যাটর্নি জেনারেল আমিনুল হক এবং খান বাহাদুর নাজিরুদ্দিন আহমদ কৌসুলি হিসেবে ছিলেন অভিযুক্ত মেজর শামসুল আলমের জন্য। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী

সেই ট্রাইবুনালে সার্জেন্ট জহুরুল হকের কৌসুলি ছিলেন। এই জহুরুল হককেই ক্যান্টনমেন্টে আটকাবস্থায় পরের বছর ১৫ জানুয়ারি হত্যা করা হয়। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান খান তাঁর অভিযুক্ত ভ্রাতা সি.এস.পি শামসুর রহমানের পক্ষে আইনজীবীর ভূমিকা নেন। দেশের নামকরা ক্রিমিনাল ল'ইয়ার জনাব জহিরুদ্দিন এই মামলার দ্বিতীয় অভিযুক্ত ব্যক্তি ও বিদ্রোহের প্রধান উদ্যোক্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের কৌসুলি হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই ছাব্বিশজন আইনজীবী বিধি অনুযায়ী পৃথক পৃথকভাবে ওকালতনামায় দস্তখত করলেও জনাব সালাম খানের নেতৃত্বে যৌথভাবেই সরকারের অভিযোগের বিরুদ্ধে অভিযুক্তদের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। এই আইনজীবীদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন তরুণ ব্যারিস্টার বা অ্যাডভোকেট। তরুণদের মধ্যে কে. জেড. আলম, আমিরুল ইসলাম, মওদুদ আহমদ প্রমুখকে বিশেষভাবে তৎপর, উৎসাহী ও কর্মব্যস্ততার মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে। আজকে বিএনপি'র বয়োজ্যেষ্ঠ নেতা মির্জা গোলাম হাফিজ ট্রাইবুনালে সাতাশ ও আটাশ নম্বর অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কৌসুলি ছিলেন।

মামলার শুরুর দিন থেকেই ঢাকা শহরসহ সমগ্র বাংলাদেশের রাজনৈতিক মহল ও সাধারণ মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বিদ্রোহের সুর পরিলক্ষিত হচ্ছিল এবং তারা এই মামলাকে হত্যার ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করছিল। মামলা শুরুর পূর্ব থেকেই শেখ মুজিবুর রহমান অন্যান্য রাজনৈতিক মামলায় কারাগারে ছিলেন। তাঁর নাম এক নম্বর আসামী হিসেবে সংযুক্ত করার ফলে ট্রাইবুনালের এই মামলাটি জনসাধারণের কাছে রাজনৈতিক মামলা হিসেবে চিহ্নিত হয় ——যদিও প্রাথমিক পর্যায়ে উদ্যোক্তারা পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করার জন্য একটি সামরিক বিদ্রোহ ও সঙ্গে সঙ্গে তাকে রাজনৈতিক অবস্থানে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। ছাত্র-যুবক ও আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তি ও দল বিচ্ছিন্নভাবে কোনো স্থির কর্মসূচি গ্রহণ করার আগেই এই মামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে শুরু করেছিল। প্রথম কিছু দিন এই মামলা-বিরোধী আন্দোলন তেমন জোরদার ছিল না এবং সরকারের হুমকি ও রক্তচক্ষুর মুখে নগণ্যসংখ্যক পত্রিকাই কেবল কিছু কথা বা বিবৃতি প্রকাশ করতে পেরেছিল।

১৯৬৮ সালের ২০ জুন, সকাল ৯টায় মামলা শুরুর দিন ঢাকা শহর ও সামরিক এলাকায় উত্তেজনাকর উৎকণ্ঠাময় এক অস্থিরতা বিরাজ করছিল। সুস্পষ্ট বুঝতে পারা যাচ্ছিল যে, কুর্মিটোলাস্থ সামরিক ঘাঁটির বাহিনী আর জনগণের অবস্থান পৃথক সত্তায় অবস্থিত। তখন থেকে ডি.এফ.আই (তিন বাহিনীর সংযুক্ত

গোয়েন্দা সংস্থা সামরিক বাহিনীর বাইরে কিছুটা প্রকাশ্য কিছুটা অপ্রকাশ্যভাবে মামলার প্রতিক্রিয়া জানা ও জনগণের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত হতে থাকে। এদের প্রধান সহযোগী ছিল প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগ। বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব মুস্তাফিজুর রহমান তখন অভিযুক্তদের ইন্টারোগেশনের কর্তৃত্ব করতেন বলে সংশ্লিষ্টগণ জানান। ট্রাইবুনাল কক্ষে প্রথমদিকে প্রবেশের সময় মনে হতো একটি ভীতিকর নির্যাতন কক্ষে অথবা গ্যাস চেম্বারে প্রবেশ করছি। ক্ষুদ্র কক্ষের বিচারকদের ডান পাশে ছিল নির্দিষ্ট কয়েকজন সাংবাদিকের জন্য চেয়ার ও টেবিল । তাঁদেরই ডান পাশে গা ঘেঁষে বক্ষ সমান্তরাল বেড়ি দিয়ে অভিযুক্তদের (আসামী) জন্য স্থান করা হয়েছিল। উঁচু এজলাসের মুখোমুখি অতি নিকটে ছিল দুই পক্ষের কৌসুলিদের বসার স্থান। তাঁদের পেছনে ছিল দর্শকদের জন্য নির্ধারিত চেয়ার। সাক্ষীর কাঠগড়া এজলাসের বাঁ হাতের কোণায়। পাকিস্তানের প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রখ্যাত কৌসুলি মঞ্জুর কাদের ছিলেন সরকার পক্ষের প্রধান আইনজীবী এবং বাংলাদেশের টিএইচ খান সরকারের দ্বিতীয় কৌসুলি হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি এখন বিএনপি সরকার সমর্থক আইনজীবীদের নেতা। অভিযুক্তদের প্রধান কৌসুলি আবদুস সালাম খান সেই সময় শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের সাথে সার্বিকভাবে না থাকলেও এই ষড়যন্ত্রমূলক মামলার ক্ষেত্রে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়েছিলেন। ঠিক ন'টার পূর্বেই আমরা যার যার প্রবেশ কার্ড দেখিয়ে কক্ষে নির্ধারিত স্থান গ্রহণ করি। প্রবেশের আগেই সাদা পোশাকে ডিএফআই ও আইবি'র লোক অনেককেই কথাবার্তা না বলার জন্য সতর্ক করে দিয়েছিলেন। আমাকে সতর্ক করার সময় তাদের কণ্ঠ যেন একটু দৃঢ় ছিল। কারণ হচ্ছে তখনকার দিনে সরকার - বিরোধী কাগজ দৈনিক 'আজাদ'-এর চিফ রিপোর্টার হিসেবে এই মামলার রিপোর্টিং-এর জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আমার নাম প্রেরণ করা হয়েছিল। ক'দিনের মধ্যেই আমার স্থলে অন্য কাউকে আজাদ থেকে প্রেরণের জন্য পত্রিকার ম্যানেজিং ডাইরেক্টরকে জানানো হয় । অর্থাৎ আমি তাদের কাছে নিরাপত্তার কারণে গ্রহণযোগ্য নই। কিন্তু আজাদের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর কামরুল আনাম খান সরকারের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে লিখিতভাবে জানান যে, "আজাদ-এর চিফ রিপোর্টার ফয়েজ আহমদ ব্যতীত আর কেউ ট্রাইবুনালের রিপোর্টের জন্য নিয়োজিত হবেন না । তাঁকে গ্রহণ করা না হলে আমাদের কোনো বিকল্প নেই এবং আজাদ এই মামলা রিপোর্ট করা থেকে বিরত থাকবে।" ক'দিন পরেই আমার নামে সর্বোচ্চ অফিস থেকে কার্ড আসে। এই ঘটনা ট্রাইবুনালের

অফিসারদের জানা ছিল। সেই কারণেই তাঁরা অসন্তুষ্ট ছিলেন। সম্ভবত প্রথম দিন আমরা ছ' থেকে আটজন রিপোর্ট করতে শুরু করি ।

ন'টা বাজার মিনিট পাঁচেক আগে বিচার কক্ষের ডানদিকের দরজা দিয়ে অভিযুক্তদের নির্দিষ্ট এলাকায় উপস্থিত করা শুরু হয়। সমগ্র কক্ষ নিস্তব্ধ। পিন পতনের শব্দও যেন শোনা যাবে। ন'টা প্রায় বাজে বাজে। বিচারকগণ পেছনের দরজা দিয়ে এজলাসে স্ব-স্ব আসন গ্রহণ করবেন। বিচারপতিগণ আগমনের পূর্বে উৎকণ্ঠিত আইনজীবীগণ এবং অতিকষ্টে অনুমতিপ্রাপ্ত অভিযুক্তদের মা-বাবা সন্তান ও আত্মীয়স্বজন দর্শকরূপে নির্বাক হয়ে পাশের দরজার দিকে তাকিয়ে আছেন । প্রথমেই অভিযুক্তদের অভিযোগের গুরুত্ব অনুযায়ী প্রদত্ত আসন নম্বর আগে থেকেই নির্ধারিত ছিল । প্রথম যিনি পাশের দরজা দিয়ে ট্রাইবুনাল কক্ষে প্রবেশ করলেন— রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত এক নম্বর ব্যক্তি, দেশের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান। ধবধবে সাদা পাঞ্জাবি ও পায়জামা পরিহিত দীর্ঘকায় শঙ্কাহীন মানুষটি দৃঢ় পদক্ষেপে নির্দিষ্ট আসনের দিকে এগিয়ে এলেন। প্রবেশের পরেই তিনি সমগ্র কক্ষটির ওপর চোখ বুলিয়ে গেলেন । খালি উঁচু এজলাসের দিকে তাকালেন। মৃদু হাসি, বলিষ্ঠ মনোভাব ও অকুতোভয় মানুষটিকে দেখার সাথে সাথে দর্শক ও আইনজীবীদের মধ্যে একটি গুঞ্জরন শোনা গেল । তিনি যেন ভুলেই গেছেন যে ফাঁসি দেয়ার জন্য ষড়যন্ত্রের কোনো মামলায় তাঁকে আনা হয়েছে । তাঁর পাশেই ছিলেন দু'নম্বর অভিযুক্ত ব্যক্তি বিদ্রোহের প্রধান পরিকল্পনাকারী লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন ও তৃতীয় ব্যক্তি তেজী স্টুয়ার্ট মুজিবর রহমান এবং তাঁর পরেই সুলতান উদ্দিন।

শেখ মুজিব চিরাচরিত অভ্যাসমতো পা বাড়িয়ে প্রথম সারির কোণার প্রথম আসনে অতি স্বাভাবিকভাবে পা ক্রস করে বসলেন। তখনি আমি তাঁর পাশাপাশি হয়ে গেলাম। মাঝখানে কাঠ ও লোহার রডের বিভাজন মাত্র। আমি রিপোর্টারদের সারিতে প্রথম ব্যক্তি হিসেবে বসা ছিলাম বলে আমার ও তাঁর মধ্যে মাত্র হাত দুয়েক ব্যবধান ছিল। এমনটি ঘটবে তা আগে ভাবি নি। একবার তাঁর মুখের দিকে চাইবার সাথে সাথে ঘোষণা হলো বিচারকগণ প্রবেশ করছেন।

প্রধান বিচারপতি এস.এ. রহমানের আসন গ্রহণের সাথে সাথে দু'পাশে দু'জন বিচারপতি আসন অলঙ্কৃত করলেন। এখন বিচার শুরু। স্বাভাবিকভাবেই

সরকারপক্ষ থেকে অভিযোগ উত্থাপিত হচ্ছে। মঞ্জুর কাদের দাঁড়িয়ে মৃদু ও সুসভ্য কণ্ঠে আনুষ্ঠানিক দিক ব্যাখ্যা করছেন। আমি এবং অন্য সমস্ত রিপোর্টারই ফাঁসির আসামী এক নম্বর অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সারাজীবনই মুজিব ভাই বলতাম। ফলে সবার মনেই একদিকে যেমন তাঁর সম্পর্কে উৎকণ্ঠা, অপরদিকে তাঁর সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য নানা প্রশ্ন জাগছিল। এমন কি এতো সতর্কতার মধ্যেও কথা বলা যায় কি না সেই ফাঁক আমরা স্ব-স্ব পদ্ধতিতে ভাবছিলাম। কিন্তু যমের মতো জাঁদরেল কালো গাউন পরিহিত তিনজন বিচারপতি এবং সতর্কতাদানকারী বহুসংখ্যক ডি.এফ.আই এবং আই.বি'র লোক ক্ষুদ্র কক্ষটিতে শ্যেনদৃষ্টিতে শেখ সাহেবের দিকে চেয়ে আছেন। ভাবলাম, মাথা ডানদিকে বাঁকা করলেই গর্দান যাবে। এমন. সময় আকস্মিক ডাক, 'ফয়েজ, ফয়েজ, এই ফয়েজ!' কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পাথরের মূর্তির মতো বিচারকদের দিকে চেয়ে রইলাম। একটু পরেই আমার ডান উরুতে শেখ সাহেব হাত বাড়িয়ে কিছু একটা দিয়ে খুঁচিয়ে দিলেন। দেখলাম তাঁর সেই বিখ্যাত পাইপের আঘাত। নিশ্চয়ই তিনি অভ্যাসের দাবিতে (তামাকহীন) পাইপ আনতে অনুমতি পেয়েছিলেন। সাধারণত কোর্টে এ সমস্ত অনুমতি দেয়া হয় না । এবার কি করি! আমি দুই পক্ষের কৌসুলিদের সামান্য তর্ক-বিতর্কের ফাঁকে পূর্বের ন্যায় প্রস্তর মূর্তির মতো অন্যদিকে তাকিয়ে মৃদু স্বরে বললাম, 'মুজিব ভাই, কথা বলা মানা। মাথা ঘোরাতে পারছি না। বের করে দেবে।' তক্ষুনি উত্তর আসলো যথেষ্ট উচ্চকণ্ঠে, 'ফয়েজ, বাংলাদেশে থাকতে হলে শেখ মুজিবের সাথে কথা বলতে হবে।' তাঁর এই কথা ছিল রাজনৈতিক ও প্রতীক ধর্মী। স্তম্ভিত কোর্ট, সমস্ত আইনজীবী ও দর্শকগণসহ সরকারি অফিসাররা তাঁর এই সুস্পষ্টভাবে উচ্চারিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। প্রধান বিচারপতি একবার ডানদিকে ঘাড় বাঁকা করে শেখ মুজিব ও অন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দিকে তাকালেন। কিছুই বললেন না। কোনো সতর্ক উচ্চারণ ছিল না। তিনি হয়তো কোর্টের আভিজাত্য বোধ থেকে এই দৃষ্টিপাতকেই যথেষ্ট সতর্কতা প্রদান বলেই মনে করেছিলেন এবং বোধহয় নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন যে, শেখ মুজিব এমন কারাগার, ভয়ভীতি, শঙ্কা ও ট্রাইবুনালের বিচারের মধ্যেও শেখ মুজিবই রয়ে গেছেন। তবে কিসের সমর্থনে শেখ মুজিবের এই মনোবল, তা তিনি এমন সুউচ্চ অবস্থান থেকে অনুমান করতে পারেন নি। তখন তিনি জানতেন না যে, শেখ মুজিবের এই প্রতীকী উচ্চারণ একজনের জন্য নয়, সমগ্র দেশের জনগণের মধ্যে অগ্নি প্রজ্বলনের বাণীস্বরূপ ।

পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করার উদ্দেশ্য নিয়ে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর কিছুসংখ্যক বাঙালি সেনা ও অফিসার ট্রাইবুনালের মামলা শুরু হওয়ার বারো বছর পূর্ব থেকেই প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এই প্রস্তুতি ছিল সশস্ত্র বিদ্রোহের। মধ্য ষাট পর্যন্ত এই সামরিক বিদ্রোহের আয়োজনের সাথে প্রথমদিকে কোনো রাজনৈতিক নেতা বা প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক বা যোগাযোগ ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে শেখ মুজিব, মওলানা ভাসানীসহ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ বাঙালি রাজনৈতিক নেতা ও কর্নেল (অবঃ) ওসমানী এবং কয়েকজন উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক কর্মকর্তার সাথে এর পরবর্তী পর্যায়ে তাদের যোগসূত্র স্থাপিত হয়। এই বিদ্রোহের উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং কার্যত যাঁকে গোপন বিদ্রোহীদের নেতা বলে গণ্য করা হতো, তিনি নেভি'র লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন। তাঁরই নির্দেশে ও পরিকল্পনা অনুযায়ী গোপন কার্যক্রম নির্বাহ করা হতো। কমান্ডার মোয়াজ্জেম নতুন রাষ্ট্রের শোষণহীন সমাজব্যবস্থার ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক কাঠামোতে একটি শাসনতন্ত্রও রচনা করেছিলেন বলে জানা যায় এবং পরিকল্পনার মধ্যে রাষ্ট্রের নাম, পতাকা ও প্রতীক পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছিল। একটি সূত্রের মতে, প্রকৃতপক্ষে করাচির বাইরে মনোরা দ্বীপের হিমালয়া ঘাঁটিতে নয়া রাষ্ট্রগঠনের এই পরিকল্পনার সূত্রপাত, যদিও মামলায় সরকারপক্ষ বলতে চেষ্টা করেছেন যে, এই বিদ্রোহের আয়োজন করাচিতেই প্রথম করা হয় ।

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্কের প্রশ্নটি কৌশলগত কারণে পরবর্তী পর্যায়ে উথাপিত হয়। প্রথমদিকে রাজনৈতিক ব্যক্তি বা রাজনৈতিক কোনো দর্শনের সাথে এই বিদ্রোহ প্রচেষ্টার কোনো সম্পর্ক না রেখে নৌ, পদাতিক ও বিমান বাহিনীর বাঙালি অফিসার-কর্মীরা ন্যায়সঙ্গত প্রমোশন, চাকরি প্রাপ্যের সুবিধাদির ব্যাপারে অভিযোগ তুলে আসছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে অর্থনৈতিক ও চাকরিগত ব্যাপক বৈষম্য এবং পূর্ব বাংলাকে অর্থনৈতিকভাবে শোষণ ক্রমান্বয়ে তাঁদের বিক্ষুব্ধ করে তুলতে থাকে । এই সমস্ত বৈষম্যজনিত বিক্ষোভই তাঁদের নতুন একটি রাষ্ট্রগঠনের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ করে এবং পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ ও অসন্তোষ ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেতে পেতে বিদ্রোহের আয়োজনকে ত্বরান্বিত করে তোলে। গোপন বিদ্রোহীরা শেষ পর্যন্ত বৈষম্য ও সমস্যাদির সমাধানের পথ না পেয়ে স্বাধীন বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। পাকিস্তানের ইতিহাসে সশস্ত্র বাহিনীতে বাঙালিদের এই ধরনের দুঃসাহসিক অভিযানের কথা ইতিপূর্বে শোনা যায় নি । শুধু সামরিক বাহিনীতে কেন,

বেসামরিক চাকরির ক্ষেত্রে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্পগঠনের সুযোগ-সুবিধার এলাকাতেও পূর্ব বাংলার মানুষ রাজনৈতিকভাবে তখন ক্ষুব্ধ ছিল। বিদ্রোহীদের কারো কারো মতে, এই রাজনৈতিক সংগ্রামকে তাঁদের বিদ্রোহের সাথে এক পর্যায়ে সংযুক্তির মাধ্যমে প্রজ্বলিত করে তোলার ব্যাপারেও চিন্তাভাবনা ছিল।

পরিকল্পিত বিদ্রোহের কেন্দ্রবিন্দু কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন অতিমাত্রায় গোপনীয়তার সাথে তথ্যাদি রক্ষা করতেন। কিন্তু তবুও এই পরিকল্পনাকে কার্যকর করার জন্য আর্মি মেডিক্যাল কোরের ডাক্তার ক্যাপ্টেন খোরশেদ উদ্দিন আহমদ (চৌত্রিশ নম্বর অভিযুক্ত) ও সেনাবাহিনীর আরো বিশ্বস্ত কয়েকজন লোককে বলতে হয়েছিল। এই বিদ্রোহ প্রচেষ্টাকেই সরকার ষড়যন্ত্র বলে আখ্যায়িত করেছেন। মামলাটির শুনানি মাঝে মাঝে বিরতির কারণে বিলম্বিত হচ্ছিল। বাংলাদেশে তখন ঢাকা ও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে এই মামলার বিরুদ্ধে বক্তব্য উত্থাপিত হতে থাকে এবং প্রধানত ছাত্র-যুবকরা ঢাকায় মিছিল বের করে মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানায়। ন্যায়সঙ্গত দাবির আন্দোলন সহজেই সংক্রমিত হয়। রাজনৈতিকভাবে যাঁরা আওয়ামী লীগে ছিলেন না, তাঁদের মধ্যেও এই আন্দোলন প্রবেশ করে। শেখ সাহেবের নেতৃত্বের শূন্যতার মধ্যে আওয়ামী লীগ প্রতিবাদ জানাতে আরম্ভ করে, কিন্তু সতর্কতার সাথে। সরকার কতোটা প্রত্যনীকের ভূমিকা গ্রহণ করবে এবং জনগণ তথাকথিত 'আইনানুগ' বিচারের বিরুদ্ধে কতোটা দাঁড়াবার সাহস লাভ করবে, সেই বিষয়টি অনেককে ভাবিয়ে তুলছিল। এই সময় সরকার-বিরোধী পত্রিকাগুলো ট্রাইবুনালের হুবহু রিপোর্ট করা সত্ত্বেও ক্রমান্বয়ে অগ্রগামী জনগণের সাথে সাথে এই মামলাকে মিথ্যা মামলা বলতে আরম্ভ করে। অবশ্য সরকারি দলের প্রধানত ট্রাস্টভুক্ত পত্রিকাগুলো জনগণের বক্তব্যের বিরুদ্ধে থেকে সরকারি নির্দেশ মোতাবেক প্রবলভাবে সরকারকে সমর্থন করতে থাকে।

আইয়ুব খান পাকিস্তানের দুই অংশের ট্রাস্ট পত্রিকাগুলো (২১টি) সৃষ্টি করেছিলেন প্রয়োজনে গণবিরোধী ভূমিকা নিয়ে সরকারকে সমর্থন করার জন্যই। অবশ্য জনগণ-বিরোধী এই ভূমিকার জন্য তাদের শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল অগ্নিশিখায় । মামলা-বিরোধী পত্রিকাগুলোর সাংবাদিকরা তখন এই মামলাকে মিথ্যা মামলা হিসেবে অভিহিত করে আসলেও, প্রকৃতপক্ষে সেনাবাহিনীর কতিপয় বাঙালি অফিসার-কর্মীসহ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অফিসারদের পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করার এই প্রাথমিক সশস্ত্র আয়োজন সত্য ও বাস্তব ছিল। দেশ, জাতি ও জনগণের কল্যাণে তারা তখন ফাঁসির কাষ্ঠ

থেকে দেশপ্রেমিকদের উদ্ধারের উদ্দেশ্যে মামলাটিকে মিথ্যা বলে অভিহিত করে মিথ্যার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। এই 'মিথ্যা' স্বাধীনতা আন্দোলনের কলাকৌশলের অংশ বলে অভিহিত করা বাঞ্ছনীয় । ইতিহাসের সর্বত্র দেখা গেছে, জনগণের কল্যাণার্থ সাময়িককালের জন্য এই জাতীয় 'মিথ্যা' প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হয়েছে এবং পরবর্তীকালে যখন সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, সে সময় ইতিহাস পূর্বোক্ত মিথ্যাকে সত্যের সম্মানে ভূষিত করেছে। কমান্ডার মোয়াজ্জেম যখন এই গুপ্ত বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তখন একপর্যায়ে তাঁর দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পাচ্ছিল এবং তাঁর পদোন্নতি ব্যাহত বা চাকরিচ্যুত হবার আশঙ্কায় চিন্তিত হয়ে পড়েন—এই বিদ্রোহ প্রচেষ্টা বা তাঁদের স্বাধীন বাংলার আন্দোলন কোনো প্রকারে যেন বাধাগ্রস্ত না হয়, সেদিকে গোপন দলটির লক্ষ্য ছিল এবং তারা মোয়াজ্জেমের চাকরি যাতে অব্যাহত থাকে সেই চেষ্টায় লিপ্ত হন। তাঁদেরই অন্যতম উক্ত ডাক্তার ক্যাপ্টেন খোরশেদ এই উৎকণ্ঠা থেকে গোপনীয় দলটিকে তখনকার মতো রক্ষা করেন। তিনি আর্মির চোখের চিকিৎসক হিসেবে প্রতিবারই কমান্ডার মোয়াজ্জেমের চক্ষু পরীক্ষা করে 'দৃষ্টিশক্তি চমৎকার' বলে কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট করে গেছেন। এর ফলে দৃষ্টিশক্তি হ্রাসের কারণে কমান্ডার মোয়াজ্জেমের চাকরিচ্যুতি অথবা পদোন্নতি ব্যাহত হবার আশঙ্কা দূরীভূত হয়। ডাঃ খোরশেদের এই 'মিথ্যা রিপোর্ট' তখন ছিল বিদ্রোহ প্রয়াসকদের কাছে এক অসাধারণ মনোবলস্বরূপ। এক পর্যায়ে লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেমকে পাকিস্তানের প্রথম সাবমেরিন ফ্লিটে একটি গৌরবপূর্ণ ও সম্মানজনক চাকরিতে বদলি করা হয় (হয়তো সরকার প্রাথমিক কোনো রিপোর্টের ভিত্তিতে মোয়াজ্জেমকে অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যই সমুদ্র তলদেশে চাকরি দিয়েছিলেন)। সাবমেরিন ফ্লিটে এই চাকরি সম্মানজনক হলেও বিদ্রোহের সাথে গোপনে সম্পর্কিত অন্যরা বিচলিত হয়ে পড়েন। তাঁরা মনে করেন যে, কমান্ডার মোয়াজ্জেমের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হলে এই বিদ্রোহ-প্রয়াস বন্ধ হয়ে যাবে। বিদ্রোহ আয়োজনের গুরুত্বপূর্ণ সেই পর্যায়ে সমগ্র প্রয়াস ক্ষতিগ্রস্ত হবে মনে করে নতুন পদ থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য পুনরায় তিনি আর্মি ডাক্তার খোরশেদের শরণাপন্ন হন। ডাক্তারকে এবার আর মিথ্যে রিপোর্ট দিতে হলো না—তিনি সত্যি রিপোর্ট দিলেন যে কমান্ডার মোয়াজ্জেমের দৃষ্টিশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই রিপোর্টের ফলে উচ্চতর কর্তৃপক্ষ সাবমেরিনে মোয়াজ্জেমের গুরুত্বপূর্ণ বদলি বাতিল করে দেন ; কিন্তু এইপর্যায়ে চাকরিচ্যুত করতে না পেরে তাঁকে চট্টগ্রামের ঘাঁটিতে নিযুক্ত করা হয়। এক্ষেত্রেও একই ঘটনাকে প্রয়োজনে কখনো মিথ্যা

কখনো সত্য বলা হয়েছে এবং কমান্ডার মোয়াজ্জেম তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী বিদ্রোহের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে পেরেছিলেন।

বিদ্রোহের আয়োজনকারীরা করাচি থেকেই সংশ্লিষ্ট স্থান ও ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করতে থাকেন এবং ঢাকায় একটি অফিস খোলা হয়। ঢাকায় প্রথমে দীননাথ সেন রোডে (গেন্ডারিয়া) এবং পরে আজিমপুরস্থ চীনা বিল্ডিং গলির 'সাইকি' বাড়িতে ও গ্রিন স্কোয়ারে এই বিদ্রোহীদের গোপন অফিস করা হয়েছিল বলে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি সূত্রের কাছ থেকে জানা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশ কাজ হতো দলের অনেকের অজান্তে ধানমন্ডির অপর একটি বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত অফিসে। কমান্ডার মোয়াজ্জেম চট্টগ্রাম, ঢাকা ও করাচির মধ্যে বিভিন্ন জনের মাধ্যমে ও নিজে যোগসূত্র রক্ষা করতেন। ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে এঁদের কারো কারো মতে তাঁদের দলের মধ্যে 'অসৎ ব্যক্তির' অনুপ্রবেশ ঘটেছে বলে ধরে নেয়া হচ্ছিল। বিদ্রোহীদের তৎপরতা করাচিতেই অনেকটা পরিপক্ক হয়ে আসে।

আওয়ামী লীগ প্রধান জননেতা শেখ মুজিবের সাথে প্রথম ১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে করাচিতে যোগাযোগ করা হয়। সরকারি অভিযোগ অনুযায়ী অন্যতম উদ্যোগী ও পরবর্তীকালে মামলায় বৈরী সাক্ষী কামালউদ্দিন আহমদের করাচির মোয়াল্লিমাবাদ হাউজিং সোসাইটিতে বিদ্রোহীদের এক গোপন সভায় শেখ মুজিবুর রহমানকে আনা হয়েছিল। সেই সভায় কমান্ডার মোয়াজ্জেম আরো পাঁচজন সহকর্মীর সম্মুখে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রথমবার ব্যাখ্যা করেন। তিনি তখন ক্ষমতা দখলের জন্য অস্ত্রের সাথে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কের ওপর বিশেষ

গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। ১৯৬৫ সালের জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে মোয়াজ্জেমের সাথে কে.ডি'র বাংলোতে পুনরায় শেখ মুজিবের বৈঠক হয় বলে 'অভিযোগ' আছে। প্রকৃতপক্ষে শেখ মুজিবের সাথে বিদ্রোহী গ্রুপের নেতাদের তিনবার বৈঠক হয় । বর্তমানে জীবিত অভিযুক্তদের অনেকে প্রকাশ করেছেন যে, এই সমস্ত বৈঠকে শেখ মুজিব সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সহযোগিতা কোন্ পর্যায়ে এবং কিভাবে দেয়া হবে সে সম্পর্কিত তথ্য কেউ সঠিকভাবে বলতে পারছেন না । কারণ বোধ হয় এই যে, কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তিই সার্বিক খবরাখবর রাখতেন না । অর্থাৎ গোপনীয়তা রক্ষার জন্য প্রত্যেকে যার যার করণীয় খণ্ডিত অংশটুকু জানতেন—যাতে করে কোনো

এক বিশেষ ব্যক্তির মাধ্যমে সরকার বিদ্রোহ প্রচেষ্টার সমস্ত খবর বের করতে না পারেন। বিদ্রোহের স্বাভাবিক নিয়মেই এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল।

উল্লেখ্য, শেখ মুজিব ১৯৬৩ সালে গোপনে আগরতলা গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শচীন্দ্রলাল সিংহের সাথে দেখা করে তাঁর মাধ্যমে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে যোগাযোগ করেছিলেন। তাঁর এই যোগাযোগের সাথে আলোচিত বিদ্রোহীদের পরিকল্পনার কোনো যোগসূত্র ছিল কি না, তা কেউ বলতে অক্ষম। (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

গোপন গ্রুপটির এক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের আগেই তাঁদের কয়েকজন সদস্য পূর্ব বাংলায় ছুটি নিয়ে এসেছিলেন। যুদ্ধের প্রেক্ষিতে সরকার তিন নম্বর অভিযুক্ত স্টুয়ার্ড মুজিব ও চার নম্বর অভিযুক্ত সুলতানউদ্দিনকে চট্টগ্রাম নৌঘাঁটিতে যোগদান করতে বলেন। কিন্তু তাঁদের করাচিতে বদলির নির্দেশ ছিল। ফ্লাইট সার্জেন্ট মোঃ ফজলুল হক এ সময় থেকেই বিমান বাহিনী অংশে তাঁদের লক্ষ্য সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। করাচি থেকে এই গোপন তৎপরতায় সহযোগিতা দান ও অর্থ সংগ্রহের জন্য এক্স-কর্পোরাল আমির হোসেন মিয়া নামক একজনকে ঢাকায় প্রেরণ করা হয়। তিনি বাসা ভাড়া করে অঘোষিতভাবে গোপন গ্রুপের 'কোষাধ্যক্ষে'র কাজ করতে থাকেন। ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান অফিসে বদলির ব্যবস্থা করে গোপন কাজের জন্য তাঁকে ঢাকায় আনা হয়েছিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই গুপ্ত দলের কাছে যে সমস্ত তথ্য উপস্থিত হয় তাতে দেখা যায় যে— আমির হোসেন সংগৃহীত অর্থের মোটা অংশ ব্যাপকহারে আত্মসাৎ করেছে। এমন কি তাঁর বিরুদ্ধে নানা সামাজিক অনাচারের অভিযোগও উঠতে থাকে ।

এদের কাছে বিদ্রোহের সমস্ত আয়োজন সন্তোষজনক বলে প্রতীয়মান হওয়ার পর আরো কয়েকজন নেতার সাথে বিদ্রোহীগণ সংযোগ স্থাপন করেন। বিদ্রোহী গ্রুপ কর্নেল এম.এ.জি. ওসমানীর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁদের পরিকল্পনা প্রকাশ করেন । তাঁরা কর্নেল ওসমানীর সহযোগিতা সম্পর্কে আশাবাদী ছিলেন। এই গ্রুপের একজন অভিযুক্ত ব্যক্তি (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) আমার সাথে আলাপের সময় বলেছেন যে, কর্নেল ওসমানী স্বাধীনতার পক্ষে মতামত দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কৌশলগত কারণে কিছুদিন অপেক্ষা করার পক্ষে বক্তব্য রাখেন। কর্নেল ওসমানীর মতে, বাঙালি সৈনিকদের শক্তি ও সংখ্যা আরো বৃদ্ধির জন্য অপেক্ষা করতে হবে এবং অন্তত দশটি বাঙালি রেজিমেন্ট

গঠন করার পর এই বিদ্রোহের সফলতা লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। সে সময় বাঙালি রেজিমেন্ট ছিল ছয়টি।

কর্নেল ওসমানী বিদ্রোহীদের সাথে প্রথম সাক্ষাতে প্রস্তাবের বিরোধিতা না করলেও বলেছিলেন, 'কলম তরবারি অপেক্ষা শক্তিশালী।' শেষের দিকে এক সাক্ষাতে তিনি ইংরেজিতে বলেছিলেন, 'সেপাই সুরু মিয়া (প্রতীক নাম) এখনো হামাগুড়ি দেয়ার উপযুক্ত হয় নি।' মুরব্বিসুলভ এই জাতীয় বক্তব্য অভিজ্ঞতার থেকেই তিনি প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু বিদ্রোহের প্রতি সমর্থনের ইঙ্গিত দিয়ে বিদ্রোহীদের সন্তুষ্ট করেন ।

তবুও বিদ্রোহী গ্রুপ অধিকসংখ্যক রেজিমেন্টের আশায় সময় ক্ষেপণ করতে সম্মত হন নি। একজন বিদ্রোহীকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল মওলানা ভাসানী ও অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের সাথে কথা বলার জন্য। উক্ত ব্যক্তির ভাষ্যমতে, দুই নেতাই নানা বক্তব্য বলার পর সতর্কতার সাথে বিপ্লব সংগঠনের পক্ষে মত দেন। এছাড়াও তাঁরা কোনো কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সাথে দেখা করেছেন, যাঁরা প্রথমদিকে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ছিলেন। বর্তমানে তাঁরা প্রয়াত । বিদ্রোহী গ্রুপের একই ব্যক্তি অপর একজন গুরুত্বপূর্ণ প্রাক্তন বিচারপতির সাথে সাক্ষাৎ করেন। সেই বিচারপতি মোহাম্মদ ইব্রাহীম একটি বিষয়ে সরকারের সাথে দ্বিমত পোষণ করে আইয়ুবের মন্ত্রিসভা থেকে তখন পদত্যাগ করেছিলেন। তাঁর সাথে সাক্ষাতের সময় তিনি বিদ্রোহীদের প্রতি সমর্থন জানিয়ে তাদের সাফল্য কামনা করেন।

সশস্ত্র বিদ্রোহের সন্তোষজনক প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে ভেবে সংশ্লিষ্ট নেতৃবর্গ উচ্চপর্যায়ের এক গোপন বৈঠকে ডি.ডে বা সশস্ত্র বিদ্রোহের দ্বারা ক্ষমতা দখলের দিন ধার্য করেন। দিনটি ছিল প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রতিষ্ঠা দিবস ২০ ফেব্রুয়ারি। ১৯৬৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিংশতিতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সরকারিভাবে চট্টগ্রামে পালনের সিদ্ধান্ত হয়। একই সময় চট্টগ্রামে ষষ্ঠ বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠন করা হচ্ছিল। পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধান সেনাপতিসহ বহু গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অফিসারদের সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেই সময় দিবসটি পালনের জন্য চট্টগ্রামে আসার কথা ছিল। বিদ্রোহীরা সরকারের পরিপূর্ণ কার্যক্রম ও পরিকল্পনা জানতেন। তারই প্রেক্ষিতে উক্ত প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর দিন বিদ্রোহীরা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল ও স্বাধীনতা ঘোষণার পরিকল্পনা করেন এবং পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জেনারেল

মুসাসহ অন্যদের গ্রেফতার করবেন বলে স্থির করা হয়েছিল। এও সিদ্ধান্ত ছিল যে, একই সঙ্গে ঢাকা সেনানিবাসের পদাতিক ও বিমান বাহিনীর অস্ত্রাগার প্রথম আক্রমণেই বিদ্রোহীগণ হস্তগত করে নেবেন। কুমিল্লা, যশোর ও উত্তরবঙ্গের ঘাঁটিগুলোতেও বিদ্রোহীদের সংযোগ ও পরিকল্পনা কার্যকর করার ব্যবস্থা প্রায় সম্পন্ন ছিল। ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক বিমান বাহিনীর অধ্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের দায়িত্বে ছিলেন। সামরিক বিমানসহ কোন ধরনের বিমানই যেন আকাশে উড়তে না পারে তার কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে ঐতিহাসিক সিপাহী বিদ্রোহের প্রায় সমতুল্য স্বাধীনতা ঘোষণার উদ্দেশ্যে আয়োজিত এই বিদ্রোহ তখনো জনগণের মধ্যে কোনভাবেই প্রচারিত বা প্রকাশিত হয় নি। তাদের যে 'বিপ্লবী পরিষদ' উদ্যোক্তাগণ গঠন করেছিলেন, সেই বিষয়টি সম্পর্কেও বিদ্রোহীদের সকলের মধ্যে সঠিকভাবে তথ্য দেয়া ছিল না। বিদ্রোহীরা নিশ্চিত ছিলেন যে, এই বিপ্লবী পরিষদের আহ্বানে বিদ্রোহের সাথে সাথে নির্যাতিত, নিপীড়িত পূর্ববঙ্গের আপামর জনসাধারণ বিদ্রোহীদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করবে। চট্টগ্রামে বিদ্রোহ শুরুর আয়োজন সংক্রান্ত এই তথ্যাদি জনগণের গণআন্দোলনের মধ্যে মামলাটি খারিজ বা প্রত্যাহৃত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট সর্বোচ্চ পর্যায়ের নেতাদের কাছ থেকে জানা গেছে ।

কিন্তু পরবর্তীকালে এই মামলায় সরকারের তৃতীয় সাক্ষী ও বিদ্রোহীদের ঢাকা অফিসের তথাকথিত কোষাধ্যক্ষ এক্স-করপোরাল আমির হোসেন মিয়া এবং কারো কারো মতে, অন্যান্য সূত্র থেকে সরকারের গুপ্ত তথ্য সংগ্রহকারীরা চট্টগ্রামে আসন্ন বিদ্রোহ সংক্রান্ত তথ্যাদিসহ বিদ্রোহীদের অনেক কার্যক্রমেরও খবর সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। বিদ্রোহীদের বহু গোপন তথ্য শত্রুপক্ষের (সরকার) কাছে পৌঁছাচ্ছে বলে সর্বোচ্চ বিপ্লবী পরিষদ জানতে পারেন। সরকার তাদের প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ত্বরিত গতিতে ১৯৬৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের অনুষ্ঠিতব্য অনুষ্ঠানটি প্রায় বাতিল করে দেন এবং প্রধান সেনাপতি জেনারেল মুসাসহ উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারদের চট্টগ্রামে আসা বন্ধ হয়ে যায়। একই সাথে প্রাপ্ত খবরাদির ভিত্তিতে কোনো প্রচার-প্রচারণা না করে সরকার গোপনে কিছু কিছু গ্রেফতার শুরু করেন।

বিদ্রোহীগণ বিভিন্ন তথ্য থেকে জানতে পারেন যে, প্রধানত অর্থ আত্মসাৎকারী আমির হোসেনের মাধ্যমেই এই সমস্ত খবর সরকারের কাছে পৌঁছেছে। ফলে সংশ্লিষ্ট সকলে বিশেষ সতর্কতামূলক অবস্থান গ্রহণ করতে থাকেন। কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন বিদ্রোহের বহু গোপন তথ্যের অধিকারী বিশ্বাসঘাতক

আমির হোসেনকে প্রাণদণ্ডের নির্দেশ দেন বলে একটি তথ্য থেকে জানা যায়। এই জাতীয় গোপন সশস্ত্র বিপ্লবের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশেই দেখা গেছে, দলনেতাগণ দেশ-জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতক ও গোপন তথ্যসমৃদ্ধ ব্যক্তিদের বিশ্বাস ভঙ্গের জন্যে প্রাণদণ্ড দিয়ে থাকেন। আমির হোসেনকে হত্যার দায়িত্ব পড়েছিল নয় নম্বর সরকারি সাক্ষী নায়েব সুবেদার আশরাফ আলী খানের ওপর। কিন্তু আশরাফ আলী ছিলেন আমির হোসেনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি সরকারের পক্ষে যাবেন সিদ্ধান্ত করে আমির হোসেনকে হত্যার নির্দেশের কথা প্রকাশ করে সতর্ক থাকতে বলেন। এইসব চরম বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদ্রোহীদের মধ্য থেকে কারো কারো সরকারের কাছে গোপনে আত্মসমর্পণের কারণে বিদ্রোহীদের মধ্যে বিপর্যয় নেমে আসতে থাকে ।

১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাসে একদিকে সরকার ও অপরদিকে বিদ্রোহীদের হাত থেকে প্রাণরক্ষার উদ্দেশ্যে সেই আমির হোসেন পিন্ডিতে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা অফিসে উপস্থিত হন। তিনি তার জানা বিদ্রোহ সংক্রান্ত আনুপূর্বিক ঘটনা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নাম-ঠিকানাসহ তেষট্টি পৃষ্ঠাব্যাপী একটি সুদীর্ঘ বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ লিখিত বিবৃতি দেন। তার এই বিশ্বাসভঙ্গের ঘটনার সূত্র ধরেই 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য' মামলা সাজানো হয়। ঐতিহাসিকভাবে রাজনৈতিক ব্যাখ্যায় এটি একটি বিদ্রোহের মামলা। প্রথমে সরকার সেনাবাহিনীর সাথে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে 'মিউটিনি'র অভিযোগ এনে কোর্ট মার্শাল বা অন্য ধরনের ট্রাইবুনালের ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী চিন্তায় তারা সত্তর সালের আসন্ন নির্বাচনকে দৃষ্টিতে রেখে রাজনৈতিক ও আধা–রাজনৈতিক উচ্চপদস্থ বাঙালি অফিসারদের জড়িত করার সিদ্ধান্ত নেন। তাদের ধারণা ছিল ঊনসত্তর সালের প্রথম অধ্যায়ের ভেতরে বিশেষ ট্রাইবুনালে সামরিক ও বেসামরিক যৌথ উদ্যোগে পূর্ব বাংলায় বিদ্রোহের কথা উল্লেখ করে রায় প্রদত্ত হলে উক্ত রায়ের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক উত্থান স্তব্ধ করা যাবে। শেখ সাহেবসহ অনেকের ফাঁসির দণ্ডাদেশ বা কারো কারো দীর্ঘস্থায়ী কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হলে ষাটের দশকের (৬-দফাসহ অন্যান্য আন্দোলন) কঠোর ব্যবস্থার মধ্যে স্তিমিত হতে বাধ্য হবে। তার ফলে সত্তর সালের নির্ধারিত নির্বাচনে আইয়ুব খাঁ ও তার কনভেনশন মুসলিম লীগের বিজয় সুনিশ্চিত হতে বাধ্য। সে সময় সমগ্র বাঙালিদের সমন্বিত ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সুযোগ থাকবে না । এই স্ট্র্যাটেজিক কারণে জেলখানাতেই অন্য রাজনৈতিক মামলায় আটক শেখ মুজিবুর রহমান ও তিনজন উচ্চপদস্থ

বাংলাদেশের স্বার্থপন্থী সিএসপি অফিসারকে এই মামলায় সংযুক্ত করা হয়। নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা অফিস এবং আইয়ুব খাঁর রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদের এই কৌশলগত দিকটি শেষ পর্যন্ত তাদের সরাসরি বিরুদ্ধে গিয়েছিল। আরো অন্যান্য ক্ষেত্রে দেখা গেছে, পশ্চিম পাকিস্তানের নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা বিভাগের অফিসাররা পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিদ্বেষমূলক কারণে এবং প্রভুতুষ্টির প্রয়োজনে ভ্রান্ত ও আনুমানিক রিপোর্ট কেন্দ্রকে দিয়েছে। বাংলাদেশের মৌলিক দাবি, চেতনা, আন্দোলন ও বিদ্রোহ সম্পর্কে তাদের ব্যাখ্যা ও উপদেশ প্রায়ই ছিল পূর্ব বাংলা এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর পরিপন্থী। এই সর্বশেষ সিদ্ধান্তের ফলে কারাগারে পূর্ব থেকেই নিক্ষিপ্ত শেখ মুজিবুর রহমানকে এই মামলায় প্রধান অভিযুক্ত (আসামী) করে উক্ত মামলার সূত্রপাত। তারা ১৯৬৭ সালের ৯ ডিসেম্বর থেকে সমগ্র পাকিস্তান তন্নতন্ন করে সন্ধানের পর বিদ্রোহের আয়োজনের সাথে জড়িতদের গ্রেফতার করতে শুরু করেন। এই মামলাটি বিশেষ ট্রাইবুনালে দেশদ্রোহিতা, মিউটিনি বা বিদ্রোহ করার অভিযোগে প্রধানত পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২১-ক ধারা ও উক্ত দণ্ডবিধির ১৩১ ধারা অনুযায়ী দায়ের করা হয়। প্রথমে ডিফেন্স অব পাকিস্তান রুল ও ডিফেন্স সার্ভিস আইনে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়েছিল। এই মামলার ১১ জন রাজসাক্ষী কোনো-না-কোনোভাবে উক্ত বিদ্রোহ প্রচেষ্টার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কিন্তু সাক্ষী কামালউদ্দিনসহ তিনজন শেষ পর্যন্ত সরকারের পক্ষে সাক্ষী দিতে দাঁড়িয়ে কাঠগড়ায় বৈরী সাক্ষীর ভূমিকা অবলম্বন করেন। এই তিন বৈরী সাক্ষী বিশেষ করে নির্মমভাবে নির্যাতিত কামালউদ্দিনের উদ্‌ভ্রান্তমূলক সাক্ষ্য ষড়যন্ত্রমূলক মামলাটিকে প্রকৃতপক্ষে নস্যাৎ করে দেয় ।

পঁয়ত্রিশজন অভিযুক্ত ব্যক্তিই ট্রাইবুনালে নিজেদেরকে নির্দোষ বলে বিচারকদের সম্মুখে বলিষ্ঠতার সাথে ঘোষণা করেন। মামলার বিরুদ্ধে সে সময় ঢাকাসহ পূর্ব বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে গণআন্দোলন শুরু হতে থাকে। সরকারি ভাষ্য শোনার পর এবং কোনো কোনো সূত্র থেকে কয়েকজন রিপোর্টার উৎসাহী হয়ে জানতে পারেন যে, এই বিদ্রোহের উদ্যোগটি সত্য। তখন থেকে আমরা কিছুসংখ্যক রিপোর্টার মামলার জেরার অংশ, যাতে মামলাটির বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে বৃহত্তর কল্যাণের উদ্দেশ্যে পত্রিকায় রিপোর্ট উপস্থাপন করতে থাকি । জেনেশুনেও এখানে আমরা সত্যকে মিথ্যা বলেছি।

এই মামলা শুরুর প্রথম দিন থেকে শেষ পর্যন্ত অনেক ঐতিহাসিক, ব্যক্তিকেন্দ্রিক উল্লেখযোগ্য ও অর্থবোধক তুচ্ছ ঘটনা ঘটেছে। সে সমস্ত ঘটনা মামলার রিপোর্টের সাথে সংযোজন করতে গিয়ে আইনানুগ দৃষ্টিতে অভিযুক্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকায় আমি (তখন বিরোধী দলীয় পত্রিকা দৈনিক 'আজাদ'-এর চিফ রিপোর্টার) অন্য পথ অবলম্বন করেছিলাম। তাতে বিড়ম্বনা ও ভয়ের কারণ ছিল। তবুও 'ট্রাইবুনাল কক্ষে' এই নামে মূল রিপোর্টের বাইরে প্রায় প্রতিদিনই আমি সমস্ত রিপোর্ট লেখার পর সংশ্লিষ্ট সাধারণ ঘটনাবলি নিয়ে একটি কলাম পত্রিকায় নিয়মিত লিখেছি। বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলি আবদুস সালাম খান ও আরো কয়েকজন প্রথম রিপোর্টেই আশ্চর্য হয়ে আমাকে অভিনন্দন জানান, কিন্তু খান সাহেব আমাকে বললেন, 'বিপদে যেন না পড়েন'। আমি বললাম, 'সেক্ষেত্রে আরেকটি মামলার ডিফেন্সে আপনাকে দাঁড়াতে হবে।' তিনি সবার সাথে হেসে উঠলেন। প্রথম দিনে প্রথম মুহূর্তটি অবশ্যই রিপোর্টযোগ্য ছিল। কিন্তু ডি.এফ. আই এবং আই.বি-দের রক্তচক্ষু ও সতর্কতার মধ্যে আমাদের সর্বদাই কি যেন একটা আতঙ্ক ঘিরে রাখতো । তবুও সাংবাদিকরা প্রধানত সামরিক বাহিনীর বাইরের পরিচিত অভিযুক্ত রাজনৈতিক ও সরকারি উচ্চপদস্থ অফিসারদের সাথে ক্রমান্বয়ে সংযোগ রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। বাইরের আন্দোলন আরো বেগবান ও উত্তপ্ত করে তোলার জন্যে রাজনৈতিক শক্তির ব্যাপক তৎপরতা বৃদ্ধি প্রয়োজন হয়ে পড়ছিল। সে সময় প্রধান অভিযুক্ত ব্যক্তি অর্থাৎ যাঁর নাম ধরে এই মামলা, সেই শেখ মুজিবুর রহমান মওলানা ভাসানীর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করেন। তিনি কাগমারিতে অবস্থানরত মওলানা ভাসানীকে বাইরের আন্দোলনে নেতৃত্বদানের আহ্বান জানিয়ে জনৈক সাংবাদিককে এই খবর পৌঁছে দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। শেখ সাহেব জানতেন যে, প্রথম শ্রেণীর জনবরেণ্য কোনো নেতা অগ্রগামী ভূমিকা না নিলে বাইরের আন্দোলন অগ্নিমুখী হয়ে গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হবে না। ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা জানেন, মওলানা ভাসানী ব্যক্তিগতভাবে রাজনৈতিক দ্বিমত থাকলেও শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যাপারে অবিশ্বাস্য রকম দুর্বল ছিলেন। অতীতের অনেক রাজনৈতিক ঘটনা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। শেখ সাহেবও বিভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক দ্বিমতের মধ্যে থেকেও মওলানা সাহেবের মুখোমুখি গুরু ও শিষ্য অথবা পিতা ও পুত্রের ন্যায় ব্যবহার করতেন। তৃতীয় একজন সাংবাদিকের মাধ্যমে মওলানা ভাসানী শেখ মুজিবের আহ্বানের এই খবর পাবার সাথে সাথে উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠেন, 'শেখ মুজিব বলেছে! জানি আমাকে যেতে হবে। সরকার এদের সবাইকে ফাঁসি দেয়ার ষড়যন্ত্র করেছে।'

তার পরের দিন থেকেই মওলানা ভাসানী ঢাকার রাজপথে ।

তিনি সভা করলেন পল্টন ময়দানে । বর্তমানে আউটার স্টেডিয়াম। জনসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মতো বিদ্রোহী মানুষগুলোর মধ্যে যেন নতুন জীবন চেতনার স্ফুরণ ঘটলো। বিশেষ আদালত গোপন রিপোর্টের ভিত্তিতে সরকারি নির্দেশে প্রায়ই ঘনঘন শুনানির বিরতি দিতে শুরু করলো। এই আন্দোলনের খবর সরকারি ট্রাস্ট কাগজ বাদে সকল পত্রিকায় ব্যাপকভাবে প্রচারিত হতে শুরু করে। সরকার আধা- সামরিক ও পুলিশ বাহিনী দিয়ে নানা জায়গায় টিয়ার গ্যাস ও লাঠিচার্জই শুধু নয় – গুলি করে হত্যা শুরু করে দিল। এই আন্দোলনের ব্যাপকতা বৃদ্ধির সাথে সাথে সরকার যেমন কম্পিত হয়ে উঠলো— তারই বিচার বিভাগীয় অংশবিশেষ ট্রাইবুনালের বিচারকদের মনোভাবের পরিবর্তন গোপন থাকলেও মুখমণ্ডলের অভিব্যক্তির পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। সবচেয়ে অধিক লক্ষণীয় বিষয় ছিল কাঠগড়ায় উপবিষ্ট পঁয়ত্রিশজন সাহসী ও তেজী অভিযুক্তদের আদলে উৎফুল্ল প্রকাশভঙ্গি। তাঁরা কাগজে প্রকাশিত সমস্ত খবর না পেলেও আত্মীয়স্বজন, আইনজীবী, সাংবাদিক এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বন্দী এলাকায় প্রহরীদের কাছ থেকে অভ্যুত্থান-আন্দোলনের মোটামুটি সঠিক খবর ও তথ্য পাচ্ছিলেন। বিচলিত সরকার কোনো সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার আগেই ছাত্র-জনতার এই গণঅভ্যুত্থান হত্যা, জেল ও ভীতি প্রদর্শনের মধ্যেও প্রতিদিনই ব্যাপকতর হয়ে উঠছিল। ঢাকাসহ প্রধান শহরগুলোতে স্কুল- কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাশ তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বন্ধ। ঢাকায় বিভিন্ন স্থানে প্রতিদিন মিছিল-মিটিংয়ে সশস্ত্র পুলিশ ও ইপিআর-এর সাথে ছাত্র-জনতার খণ্ডযুদ্ধ চলছিল। অনেক ক্ষেত্রে কারফিউ দেয়া হয়েছিল। এই উত্তপ্ত ও ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে পাকিস্তান সরকার আশঙ্কা করছিল যে, এমন কি সেনানিবাসও আক্রান্ত হতে পারে। কারণ তারা লক্ষ্য করেছেন যে, শেষের দিকে প্রায় প্রতিদিনই লাশ নিয়ে মিছিল হচ্ছিল এবং পুরানা পল্টন ময়দানে লাশ সম্মুখে রেখে লক্ষ লক্ষ লোক জানাজা ও মিছিলে অংশগ্রহণ করেছে। তখন থেকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার আশঙ্কা তাদের মধ্যে দেখা দেয়। কিন্তু তারা বিমূঢ় ছিলেন বলে চিরাচরিত পদ্ধতিতে আরেকটি রাজনৈতিক হিসেবের ভুল করেছিলেন। তাঁদের তথাকথিত বিশেষজ্ঞদের রিপোর্টে কোথাও ভাবা হয় নি যে, প্রধানত শেখ মুজিব ও অন্যদের বিশেষ ট্রাইবুনালের কাঠগড়া থেকে মুক্ত না করা পর্যন্ত স্বাধীনতা ঘোষণার মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত কেউ নেবে না। এই তথ্য

সরকারেরই একটি সূত্রের। (শেখ মুজিব তখনো বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত নন। তাঁকে আমরা অধিকাংশ ঘনিষ্ঠ সাংবাদিক মুখোমুখি বলতাম 'মুজিব ভাই'। বাইরে রেফারেন্সে বলতাম শেখ মুজিব। যেমন বিশ্বে বলা হয় চার্চিল, মার্কস, মাও, জেফারসন, লিঙ্কন ইত্যাদি। পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবর্গ, সরকারি বা বেসরকারি বন্ধুগণ তাঁকে বলতেন 'শেখ সাহাব')।

এদিকে ট্রাইবুনালে বিচার আটষট্টি সাল পেরিয়ে ঊনসত্তর সালে গড়িয়েছে এবং এই সময়ই গণঅভ্যুত্থান প্রবল থেকে প্রবলতর হতে শুরু করে। জানুয়ারি মাসটি ছিল গণঅভ্যুত্থান, রাজপথ দখল, হত্যা ও সরকারি বাহিনীর পশ্চাদপসরণের কাল । বিচারের রায় ত্বরান্বিত করতে গিয়ে গণঅভ্যুত্থানের চাপকে বিচারকগণ উপেক্ষা করতে পারেন নি। তার ওপর তিনজন বৈরী সাক্ষী এই সমগ্র বিচার ব্যবস্থাকে মিথ্যা প্রতিষ্ঠার আয়োজন ও প্রহসনে পরিণত করে তোলে। তখন মামলার রায় সরকারের ইচ্ছানুযায়ী অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দিলে দেশের জন্য চরম বিপর্যয় আসতে পারে এবং নিশ্চিতভাবে রাজনৈতিক বিভেদ ও সশস্ত্র উত্থান চূড়ান্ত রূপ লাভ করতে পারে— এই আশঙ্কা তাদের মধ্যে দেখা দেয়। বিবাদী পক্ষের আইনজীবীগণ সে সময় প্রায়ই পূর্বপাক্ষিক ভূমিকা নিতেন এবং তারা ছিলেন তখন উৎফুল্ল এবং মামলা যে ভেস্তে যাবে সে সম্পর্কে অনেকটা নিশ্চিত।

বিশেষ ট্রাইবুনালের এই দোদুল্যমানতা ও অস্থিরতা এবং অভিযুক্ত ও কৌসুলিদের কঠোর মনোবলের মুখে গণঅভ্যুত্থানের প্রতিক্রিয়া ফেব্রুয়ারি মাসটিতে সম্পূর্ণভাবে বাঙালির পৃথক স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ রূপে প্রকাশ পায়। (অভিযুক্তদের কারো কারো তথ্য থেকে জানা যায়, উদ্‌ভ্রান্ত-প্রায় সরকার বন্দীদের তখন হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল)।

এই উত্তপ্ত পরিবেশে প্রতিদিনই ঢাকা শহরে মানুষ বিদ্রোহের সুরে উচ্চারিত শ্লোগান সহকারে ১৪৪ ধারা ও কারফিউ ভঙ্গ করে রাস্তায় নেমে আসতো। একদিন ঢাকা শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে মিছিলকারীদের ওপর ব্যাপক গুলিবর্ষণ করা হয়। দাবানলের মতো শহরে প্রচারিত হয় যে, বিভিন্ন অঞ্চলে গুলিতে অন্তত সাতজনের মৃত্যু ঘটেছে ও বহুসংখ্যক লোক আহত হয়েছে। নিহতদের লাশ নিয়ে বিভিন্ন দিক থেকে মিছিল শুরু হয়। দুপুরের পরে পুরানা পল্টন ময়দানে তিনটি লাশ সম্মুখে রেখে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে জানাজা অনুষ্ঠিত হবার সাথে সাথে বিক্ষুব্ধ জনতা আক্রমণমুখী হয়ে ওঠে। তাদের প্রতিশোধের

বাসনা নিবারণ করার ক্ষমতা যেন কারো ছিল না। হাজার হাজার মানুষ নানা দিকে শ্লোগান দিয়ে সরকারি অফিস ও সরকারি সমর্থকদের আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে খণ্ড খণ্ডভাবে বিভিন্ন দিকে শ্লোগান মুখরিত অবস্থায় মারমুখী অভিযান শুরু করে। এমনি একটি বিরাট বিক্ষুব্ধ হাজার হাজার মানুষের মিছিল সরকার সমর্থক দৈনিক পাকিস্তান (বর্তমানে দৈনিক বাংলা ও একই অট্টালিকায় অবস্থিত মর্নিং নিউজ পত্রিকা আক্রমণের সময় অগ্নিসংযোগ করে। প্রাণভয়ে সাংবাদিক ও অন্যান্য স্টাফ পূর্বেই বেরিয়ে গিয়েছিলেন। সেই মারমুখো জনতা পত্রিকা অফিস পুড়িয়ে দিয়েই কেবল ক্ষান্ত হয় নি, দৈনিক পাকিস্তানের উল্টোদিকের পেট্রল পাম্পের সাথে সংযুক্ত মুসলিম লীগপন্থী জনাব লস্করের বাড়িও আক্রমণ করে। সেই সময় বাড়ির ভেতর থেকে সাধারণ বন্দুক দিয়ে জনতাকে প্রতিরোধ করার সময় তিন থেকে চারজন পাখি মারার গুলিতে আহত হয়েছিলেন।

বিচারের সময় সেনানিবাসের সিগন্যাল অফিসার্স মেসে তেরোজনের সাথে বন্দী ছিলেন এক নম্বর অভিযুক্ত ব্যক্তি আওয়ামী লীগের প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান তাঁকে সেখানে হত্যার ষড়যন্ত্র হয়েছিল। ১৪ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যার সময় ক্যাম্পের বাইরে নির্দিষ্ট স্থানে শেখ সাহেব প্রহরাধীন অবস্থায় পায়চারি করছিলেন। সে সময় একজন পাঠান ক্যাপ্টেন শেখ মুজিবকে ত্বরিত নিজকক্ষে চলে যাবার জন্য গোপনে জানিয়ে যান। শেখ সাহেব তাঁর কক্ষে চলে যান। কথাটা বন্দীশালায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে বলে সেই রাতে কিছু ঘটে নি। কিন্তু চরম নৃশংসতা ঘটে পরদিন ১৫ ফেব্রুয়ারি ভোর সাড়ে ছ'টার দিকে। শেখ সাহেবের এলাকা থেকে দূরবর্তী থার্ড পাঞ্জাব রেজিমেন্টের হেড কোয়ার্টারে বন্দী ছিলেন অপর বাইশজন অভিযুক্ত ব্যক্তি । সেদিন ভোরে গার্ডের অনুমতি নিয়ে সার্জেন্ট জহুরুল হক (১৭ নম্বর অভিযুক্ত) ও ফ্লাইট সার্জেন্ট মোহাম্মদ ফজলুল হক (১১ নম্বর অভিযুক্ত) তাঁদের নির্দিষ্ট কক্ষের বাইরে টয়লেটে যাবার জন্য বের হন। মাত্র ছয়-আট ফুট দূর থেকে একজন গার্ড, সম্ভবত আগে থেকেই এই প্রস্তুতি ছিল, তাঁদের মুখোমুখি গুলি করতে শুরু করে। এই দু'জনের মৃত্যু নিশ্চিতকরণের জন্য তাঁদের ওপর গুলিবিদ্ধ অবস্থায় বেয়নেট চার্জ করা হয়েছিল। এই বীভৎস হত্যাকাণ্ড প্রচেষ্টার সাক্ষী উক্ত স্থানে বন্দীশালার অভিযুক্তরাই কেবল। গুলি ও বেয়নেট চার্জের পর মৃত মনে করে একঘণ্টা পর এই দু'জন অভিযুক্তকে সি.এম.এইচ-এ নিয়ে যাওয়া হয়। সে সময় উক্ত হাসপাতালে ডিউটিতে ছিলেন বাঙালি ডাক্তার এম.এম. আলী।

এ দু'জনকে ঠাণ্ডা মাথায় পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী বিশেষ কোনো নির্দেশে হাবিলদার মঞ্জুর হোসেন সাহ্ হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করেছিলো।

প্রথমে গুলি করা হয়েছিল জহুরুল হককে এবং তার পরেই গুলি করা হয় ফজলুল হককে। সার্জেন্ট ডাক্তার আলী দ্রুত চিকিৎসার জন্য প্রায় প্রাণহীন ক্ষতবিক্ষত সার্জেন্ট জহুরুল হককে অপারেশন টেবিলে উঠিয়ে অপারেশনের আয়োজন ও পরীক্ষা করতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তিনি দেখতে পান পরপর গুলি ও বেয়নেট চার্জের ফলে সার্জেন্ট হককে সর্বপ্রকার অপারেশন ব্যবস্থা করেও সেই মুহূর্তে রক্ষা করা যাবে না । তিনি অপারেশনে হাত দিয়েও সার্জেন্ট হককে টেবিল থেকে নামিয়ে অন্যত্র রাখেন। জানা যায়, সাধারণ নিয়মে চিকিৎসকগণ এই জাতীয় বিশেষ পরিস্থিতিতে যার প্রাণ রক্ষা করার অধিক সম্ভাবনা তাঁর চিকিৎসা প্রথমে করেন । সেই জন্য তিনি দ্বিতীয় মৃতপ্রায় ব্যক্তি ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হককে অপারেশন টেবিলে উঠিয়ে পরীক্ষা করেন। তাঁর প্রাথমিক ধারণা হলো হয়তো ফজলুল হককে বাঁচানো যাবে। তিনি বুলেটবিদ্ধ ও বেয়নেট চার্জে বিক্ষত ফজলুল হককে তিন ঘণ্টাব্যাপী অস্ত্রোপচার করেন। দেখা গেল, ফজলুল হকের হৃৎপিণ্ডে কোনো আঘাত লাগে নি, অথচ ঠিক হৃৎপিণ্ড বরাবর বুলেট বিদ্ধ হয়। সেই কারণেই সম্ভবত ফজলুল হককে বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল। পরে জানা যায়, প্রথমে সার্জেন্ট জহুরুল হককে গুলির সময় হতবাক মোহাম্মদ ফজলুল হক এই আকস্মিক আক্রমণে এমনি আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছিলেন যে, সেই মুহূর্তে তাঁর হৃৎপিণ্ড শারীরিক প্রক্রিয়ায় পাশের দিকে সরে গিয়েছিল! ডাক্তার আলী আমাকে বলেছেন, মানুষের শারীরিক গঠন এমন যে, বাইরে বা অভ্যন্তরীণ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় এই জাতীয় তাৎক্ষণিক ঘটনা ঘটতে পারে। ফ্লাইট সার্জেন্ট মোঃ ফজলুল হক সম্প্রতি প্রয়াত । রাজনৈতিক চিন্তাধারার দিক থেকে তাঁর কখনো বিচ্যুতি ঘটে নি। পরবর্তীকালে তিনি একবার জাতীয় সংসদের সদস্যও হয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের দেশের এই বীরত্বপূর্ণ সশস্ত্র বিদ্রোহের অন্যতম বীর বিদ্রোহী সার্জেন্ট জহুরুল হককে বাঁচিয়ে রাখা যায় নি। আগরতলা মামলার সেই ১৭ নম্বর অভিযুক্ত ব্যক্তির নামেই ইকবাল হলের নাম পরিবর্তন এবং তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যে আজকের এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্জেন্ট জহুরুল হক হল নামকরণ করা হয়েছে।

ডাক্তার আলী দু'জনকেই একই সাথে দু'টি পৃথক টেবিলে অপারেশনের প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু সি.এম.এইচ কর্তৃপক্ষ সেই সময় আরেকজন ডাক্তারকে

ডিউটিতে না দেয়ায় প্রাণরক্ষার সেই ব্যবস্থা কার্যকর যায় নি। আহতদের আত্মীয়রা সিভিল ডাক্তার আনার জন্য চাপ দিয়েছিলেন। কিন্তু সি.এম.এইচ কর্তৃপক্ষ তাঁদের নীতির দোহাই দিয়ে বাইরের কোনো ডাক্তারকে জরুরি অবস্থাতেও আহ্বান করতে দেন নি। ফ্লাইট ডাক্তার ফজলুল হকের অপারেশন করার পর সার্জেন্ট জহুরুল হককে অজ্ঞান অবস্থায় পুনরায় অপারেশন টেবিলে ওঠানো হয়। দীর্ঘ সময়ব্যাপী সার্জেন্ট এম.এম. আলী ও তাঁর সহযোগিগণ অতি সতর্কতা এবং উৎকণ্ঠার মধ্যে সার্জেন্ট হকের অপারেশন করেন। তাঁকে বাঁচানোর এই শেষ চেষ্টার পর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে নি। কিন্তু তিনি জীবিত ছিলেন। দ্বিতীয় টেবিলে আরেকজন সার্জেন্ট দ্বারা একই সময় দু'জনের পাশাপাশি অপারেশন হলে হয়তো পরিস্থিতি অন্যরকম হতো। রাত সোয়া ন'টার দিকে বীর সৈনিক সার্জেন্ট জহুরুল হক প্রাণত্যাগ করেন।

ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হকের স্ত্রী এই দু'টি অপারেশনের সময় সর্বদাই উপস্থিত ছিলেন। সামরিক কর্তৃপক্ষ অপারেশন শুরু হওয়ার পর্যায়ে গুরুতর আহত এই দু'জনকে করাচিতে উচ্চতর চিকিৎসার জন্য নিয়ে যেতে চান এবং একটি হেলিকপ্টার সিএমএইচ-এর অঞ্চলে নিয়ে আসা হয় তাঁদের বহনের জন্য। কিন্তু ডাক্তার আলী ও আহতদের আত্মীয়স্বজন সরকারের এই সিদ্ধান্তের ঘোরতর বিরোধিতা করেন। তাঁদের সন্দেহ আরো বদ্ধমূল হয়। ফলে সরকারের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য হয়। তখন আর বিশ্বাসের বিষয়টির প্রশ্নই ছিল না।

মামলায় অভিযুক্ত পঁয়ত্রিশজনের মধ্যে এ যাবৎ বারোজন প্রয়াত হয়েছেন এবং এঁদের মধ্যে পাঁচজনকে বিভিন্ন সময়ে হত্যা করা হয়। এক নম্বর অভিযুক্ত ব্যক্তি শেখ মুজিবকে ১৯৭৫ সালে ১৫ আগস্ট ভোরে সেনাবাহিনীর একটি ক্ষুদ্র দল ক্ষমতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষায় 'রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের' নামে সপরিবারে হত্যা করেছে । প্রধান সেনাপতি শফিউল্লা ও তাঁর অধীনস্থ কোনো সেনাপতি বা কর্মকর্তা তাদের . অধীনস্থ বাহিনী নিয়ে দেশের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবকে রক্ষার জন্য এগিয়ে আসেন নি। প্রমাণ আছে শেখ সাহেব তাঁর বাড়ি আক্রমণের সময় এদের অনেককেই টেলিফোন করেছিলেন। এমন কি তাঁর নির্দেশে গঠিত রক্ষীবাহিনী শেরেবাংলা নগর থেকে এসেও কোনো প্রতিরোধের ব্যবস্থা করে নি। কিন্তু শেখ সাহেবের নিজস্ব অফিসার বলে পরিচিত ও নবনিযুক্ত ডিএফআই প্রধান ব্রিগেডিয়ার জামিল পারিবারিক বাধা উপেক্ষা

করে শেখ সাহেবকে উদ্ধারের জন্য নিজেই গাড়ি চালিয়ে প্রেসিডেন্টের বাড়ির সম্মুখস্থ মিরপুর রোড পর্যন্ত আগমন করেন। তাঁকে বাধা দেয়া হয়। তিনি সেই বাধা উপেক্ষা করে গাড়ি থেকে নেমে আসেন শেখ সাহেবের বাড়িতে পৌছনোর জন্য। কিন্তু এই আক্রমণকারীদের নির্দেশে প্রহরারত সৈনিকরা তাঁকে উক্ত স্থানেই গুলি করে হত্যা করে। একটি দেশের প্রেসিডেন্টকে রক্ষার জন্য তাঁর সেনাবাহিনীর প্রধান বা অন্য সেনাধ্যক্ষরা এবং তাঁর পার্টির কোনো ক্যাডারও সেদিন এগিয়ে আসেন নি। তারা এখন নিজেদেরকে 'অপরাধ' ও 'অযোগ্যতার' অভিযোগ থেকে রক্ষা করার জন্য নানা রচনা ও বক্তৃতায় ইতিহাস বিকৃতির চেষ্টা যে করছেন না, তা নয়। দ্বিতীয় অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং মূল বিদ্রোহের প্রধান কর্মকর্তা কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনকে পাকিস্তান বাহিনী একাত্তরের ২৬ মার্চ সকালে ঢাকায় তাঁর বাসভবনের নিচেই নির্মমভাবে বুলেট চালিয়ে হত্যা করেছে । তিন নম্বর অভিযুক্ত ব্যক্তি তেজী পুরুষ স্টুয়ার্ট মুজিবকে কে বা কারা দেশমুক্ত হবার পরেই ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি সচিবালয় থেকে জনৈক বন্ধুর মাধ্যমে বের করে এনে একটি জিপে তুলে নিয়ে যায়। তিনি মুক্তিযুদ্ধেও অংশ নিয়েছিলেন। তারপর তাঁকে হত্যা করে তাঁর লাশ গুম করা হয়েছিল। আগেই বলা হয়েছে, মামলা প্রত্যাহারের সাত দিন আগে ঊনসত্তর সালের গণঅভ্যুত্থানের সময় ১৫ ফেব্রুয়ারি সেনানিবাসে সার্জেন্ট জহুরুল হককে এক হাবিলদার গুলি করে হত্যা করে। মামলার সময় সাতাশ নম্বর অভিযুক্ত ব্যক্তি ও বাংলাদেশ আর্মিতে পরে ব্রিগেডিয়ার নাজমুল হুদা নভেম্বর (১৯৭৫) ক্যু'র সময় ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের সাথে শত্রুপক্ষের আক্রমণে প্রাণ হারান। অন্য যাঁরা মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁদের মৃত্যু স্বাভাবিক ছিল।

এই মামলা চলাকালে ঊনষাট সালে প্রচণ্ড গণঅভ্যুত্থানের সময় সেনানিবাসে বিশেষ ট্রাইবুনালের কাজ ব্যাহত হতে আরম্ভ করে। ট্রাইবুনাল কক্ষের মধ্যে বিধি অনুযায়ী যে পরিবেশ থাকার কথা তা ছিল না। বিচার চলাকালে মাঝে মাঝে গুঞ্জরন ও হাস্যরোল শোনা যেত। এমন কি ব্যঙ্গাত্মক উক্তিও কানে আসতো। বাইরের আন্দোলনের ফলে রিচারকগণ আগের ন্যায় কক্ষে বিশেষ কড়াকড়ি অবলম্বন করতেন না। এই সময় সাধারণ হলেও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল।

একদিন দুপুরে ট্রাইবুনালে বিচার শেষে বিচারকগণ আসন থেকে উঠে স্ব-স্ব কক্ষের দিকে রওনা হওয়ার সাথে সাথে সম্ভবত তিন নম্বর অভিযুক্ত

ব্যক্তি স্টুয়ার্ট মুজিব আসামীদের কাঠগড়ার অর্ধেক পর্যন্ত লাফিয়ে উঠে দর্শক, আইনজীবী ও সরকারি কর্মচারিদের সম্মুখেই পাশে প্রহরী হিসেবে দণ্ডায়মান বিরাট চাপদাড়ি বিশিষ্ট জনৈক হাবিলদার জাতীয় একজন পুলিশকে আকস্মিকভাবে তার ডান দিকের গণ্ডদেশে সজোরে চপেটাঘাত করে বসেন। সাথে সাথে তিনি অনুল্লেখযোগ্য কয়েকটি শব্দ উচ্চারণ করে উক্ত পুলিশকে ভর্ৎসনা করতে থাকেন। এই আচমকা ঘটনায় সমস্ত কক্ষ একাধারে স্তম্ভিত ও উল্লসিত হয়ে ওঠে। তাঁর কাছ থেকে পরে জেনেছি এই চপেটাঘাতের কারণ। প্রতিদিন অভিযুক্তদের কাঠগড়ায় আনার সময় এই পুলিশ কর্মচারি অভিযুক্তদের অনেকের সাথে প্রায়ই দুর্ব্যবহার করতো। তারই প্রতিশোধ জনসমক্ষে স্টুয়ার্ট মুজিব সেদিন নিয়েছিলেন। একজনের মতে, অভিযুক্ত সুবেদার তাজুল ইসলামও একই সাথে উক্ত প্রহরীকে চপেটাঘাত করেছিলেন। তাজুলই প্রথম চপেটাঘাত করেন।

অভিযুক্ত সুবেদার তাজুল ইসলাম (বর্তমানে মৃত) একদিন বিচার চলাকালে আত্মীয়স্বজনের সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছিলেন। জনৈক বিচারপতি সতর্ক করে দিলে তিনি বিচারককে বলেন যে, ‘আসামী বলে সম্বোধন করবেন না স্যার, বাঙালি । এখন কথা বলতে না দিলেও বন্ধুবান্ধব-আত্মীয়স্বজনের সাথে এক সঙ্গেই দেখা করবো।' মুক্তিলাভ সম্পর্কে তাঁর এই দৃঢ় প্রত্যয় ছিল।

স্টুয়ার্ট মুজিব সর্বদাই তেজী পুরুষের মতো ব্যবহার করতেন। তিনি একদিন সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর আবদুল আলীম সাহেবকে ডেকে বলে ফেললেন: ‘দালালী কেন করছেন সাহেব ? দিনে কত টাকা পান ?’ আলীম সাহেব স্তব্ধ।

বাইরের আন্দোলনের তীব্রতার কারণে অভিযুক্তদের মনোবল প্রতিদিনই সুদৃঢ় হচ্ছিল। তাঁরা হাসিমুখে কক্ষে আসতেন এবং বিচারকার্যের পর আনন্দমুখর পরিবেশে কক্ষ ত্যাগ করতেন। সরকারি বৈরী সাক্ষী কামালউদ্দিন মামলাটিকে জলো ও হাস্যকর করে দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একজন সাহসী ও কৌশলি ব্যক্তি । তাঁকে পুলিশ ও ডি.এফ.আই গ্রেফতারের পর অমানুষিক নির্যাতন করে শেখ মুজিব ও অন্যদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদানের জন্য প্রবল চাপ দিয়ে আসছিল। এই নির্যাতনে তাঁর মৃত্যু ঘটতে পারতো। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি অভিযুক্তদের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সাক্ষী হতে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মনে চরম প্রতিশোধ নেয়ার পরিকল্পনা ছিল। তাঁকে অসুস্থাবস্থায় সাক্ষীর কাঠগড়ায় দু'জনে ধরাধরি করে এনেছিল। কাঠগড়ায় উঠেই তিনি

বিচারকদের সম্মুখে নির্যাতনের কাহিনী ক্রন্দন ও চিৎকার করে বর্ণনা করতে শুরু করেন এবং জানান যে, তাঁকে বলপূর্বক হত্যার হুমকি দিয়ে সাক্ষী করা হয়েছে। যদিও তিনি কিছুই জানেন না। (এই কামালউদ্দিন সাহেব বিদ্রোহের অন্যতম উদ্যোক্তা ও তাঁরই চেষ্টায় বিদ্রোহীদের সাথে শেখ সাহেবের সাক্ষাৎ হয় ও তাঁরই বাড়িতে কয়েকবার বিদ্রোহীদের বৈঠক হয়েছিল)। তিনি উচ্চকণ্ঠে সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনতে থাকেন এবং কাঠগড়ায় মাঝে মাঝে দাঁড়াতে না পেরে পড়ে যাচ্ছিলেন। এই ভয়ানক দৃশ্য এবং সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার ও নির্যাতনের কাহিনীর বর্ণনার সময় নিস্তব্ধ কক্ষে সরকার পক্ষের প্রধান কৌসুলি মঞ্জুর কাদের ও তাঁর সহযোগী এডভোকেট টি. এইচ. খান লাফিয়ে উঠে তাঁকে বৈরী সাক্ষী (হোস্টাইল) ঘোষণা করেন। তাঁকে প্রধান বিচারপতি রহমান ডক থেকে নামিয়ে'নেয়ার নির্দেশ দেয়ার সময় বিবাদী পক্ষের প্রধান আইনজীবী জনাব সালাম খান ও সহযোগীরা তাঁর বক্তব্য শোনার দাবি জানান । কিন্তু সম্ভবত আইনগত কারণে বৈরী সাক্ষী ঘোষিত হবার পর তাঁর বক্তব্য আর কোর্ট গ্রহণ করেন না। কামালউদ্দিন সাহেব দু'জনের কাঁধে ভর করে যাবার সময় বলে গেলেন, ‘এরা আবারো আমাকে মারবে। আমি আদালতে আবেদন করছি।'

প্রধান অভিযুক্ত ব্যক্তি শেখ সাহেব আন্দোলনের খবর নানা সূত্র থেকে পেলেও বিচারকদের অনুপস্থিতিতে প্রায়ই আমাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত তথ্য জেনে নিতেন। শেষের দিকে অবস্থা এমন ছিল যে, মাঝে মাঝে তাঁর সাথে দু'চার কথা বললেও ডি.এফ.আই বা পুলিশের লোক বাধা দিতে আসতো না । প্রতিদিনই কোর্ট শেষ হবার পর দীর্ঘকায় সাদা পাঞ্জাবি পরিহিত শেখ সাহেব উন্নত মস্তকে অন্যদের নিয়ে পাশের দরজা দিয়ে বীরদর্পে বেরিয়ে যেতেন। কোনো দিন তাঁকে কোর্টে বিমর্ষ বা চিন্তিত অবস্থায় দেখি নি ।

সার্জেন্ট জহুরুল হককে হত্যার পর অব্যাহত গণঅভ্যুত্থান আগের তুলনায় বহুগুণে মারমুখো হয়ে ওঠে। বাংলা একাডেমীর পাশের অট্টালিকায় প্রহরাবেষ্টিত অবস্থায় বাস করতেন বিশেষ ট্রাইবুনালের প্রধান বিচারপতি এস. এ. রহমান। ১৬ ফেব্রুয়ারি একটি উত্তেজনাপূর্ণ বিক্ষুব্ধ মিছিল মূল বিক্ষোভকারীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসে আকস্মিকভাবে এই বাড়িতে আক্রমণ ও অগ্নিসংযোগ করে। এ সময় বিচারপতি রহমান এই বৃদ্ধ অবস্থায় প্রাণ রক্ষার্থ বাঙালি বাবুর্চির লুঙ্গি পরিধান করে পেছনের দরোজা দিয়ে বেরিয়ে যান। সেদিন আগুনে দাউদাউ করে জ্বলতে থাকা প্রধান বিচারপতির বাড়িটি সমগ্র বাংলাদেশের

ক্ষোভের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হয়। (পরবর্তীকালের সরকার বাড়িটিকে ভেঙে পুষ্টিভবন তৈরি করেছেন)। এই আক্রমণের পর পাকিস্তান সরকার ২২ ফেব্রুয়ারি মামলাটি প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হন ।

ট্রাইবুনালে বিচারের দিনগুলোতে আমিও অনেক সময় ভীতিকর ও বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছি। 'আজাদ' পত্রিকায় নিয়মিতভাবে প্রশ্ন-উত্তরের ধরনে জেরা ও বিভিন্ন প্রশ্ন-উত্তর আমি লিখতাম। এ ছিল অনেকটা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ । কিন্তু আমি সতর্কতার সাথে যে সমস্ত নোট নিতাম সেগুলোই কাগজে প্রকাশিত হতো । একই সাথে আমি প্রায় প্রতিদিন মূল রিপোর্ট লেখা শেষ করে রাত বারোটার পর 'ট্রাইবুনাল কক্ষে' নাম দিয়ে একটি নিজস্ব রিপোর্ট করতাম। যার ফলে এই কাগজের বিক্রয় ও চাহিদা রাতারাতি বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। আজাদ কর্তৃপক্ষ পাঠকের চাহিদা পূরণের জন্য অবজারভার পত্রিকার অফসেট মেশিনে সেলোফিন থেকে প্লেট বানিয়ে প্রতিরাতে অতিরিক্ত সংখ্যা মুদ্রণ করতো। আজাদের নিজস্ব মেশিনে ছাপানো কাগজ দিয়ে গ্রাহকের চাহিদার এক-পঞ্চমাংশও সকালবেলা পূরণ করা যেত না। 'ট্রাইবুনাল কক্ষে' কলামটি এতো জনপ্রিয় হয়েছিল যে শেষ পর্যন্ত আমার সেই লেখাই আমার জন্য আতঙ্কের সৃষ্টি করে। প্রতিদিন রাত ন'টার দিকে ডি.এফ.আই সরকারি উকিল কর্তৃক লিখিত কোর্ট প্রসিডিং-এর সংক্ষিপ্ত ভাষ্য প্রত্যেক পত্রিকায় দিয়ে যেতেন। অধিকাংশ পত্রিকা বিপদের আশঙ্কায় এবং ট্রাস্ট পত্রিকাগুলো অতি আনন্দে হুবহু সেই রিপোর্ট ছাপিয়ে দিতো।

এই ক্ষুদ্র কলামটি প্রথম দু'তিনদিন বেরুবার পরই একদিন চা বিরতির সময় সাদা পোশাকে জনৈক ডি.এফ.আই-এর অফিসার অতি ভদ্র ভাষায় জানালেন যে, প্রধান কৌসুলি মঞ্জুর কাদের আমার সাথে কথা বলতে চান। তক্ষুনি আমার ধারণা হলো যে, কাজ সেরেছে! কনটেম্পট অফ কোর্টে পড়ে গেছি। ভদ্রলোক আমাকে কক্ষের বাইরে সংলগ্ন একটি ছোট কক্ষে নিয়ে গেলেন। টেবিলের অপরদিকে জনাব মঞ্জুর কাদের বসা এবং তাঁর মুখোমুখি আরেকটি চেয়ার আমার জন্যে। কুশল বিনিময়ের পর তাঁর সম্মুখে রক্ষিত ইংরেজিতে টাইপ করা একটি কাগজের দিকে মুখ রেখে তিনি ইংরেজিতে বললেন, 'আপনি সবচেয়ে বেশি রিপোর্ট করছেন।'

আমি নিশ্চুপ

তিনি পুনরায় বললেন, 'নাথিং রং। তবে এই জাতীয় কোর্ট রিপোর্ট ভয়ানক

ঝুঁকিপূর্ণ।'

আমি শান্তভাবে বললাম, ‘কোনো ভুলত্রুটি পেয়েছেন কি ?’

মঞ্জুর কাদের, ‘না, এখনো পাই নি। লাহোরে একজন রিপোর্টার কোর্ট রিপোর্ট করতে গিয়ে একবার বিপদে পড়েছিলেন। '

আমি বুঝতে পারলাম তিনি একই সাথে আমাকে সান্ত্বনা দিলেন আবার সতর্ক ও করে দিলেন। কিন্তু রিপোর্ট বন্ধ করতে বললেন না। ইতিমধ্যে দু'জনেরই চা এসে গিয়েছিল।

বললাম, ‘আপনি আমার কোন্ রিপোর্ট সম্পর্কে বলছেন ?’ .

মঞ্জুর কাদের, ‘ইন দি কোর্ট রুম। (ট্রাইবুনাল কক্ষে) রিপোর্টারের পক্ষে এই জাতীয় রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ মামলার যে ধরনের রিপোর্টই হোক না কেন বিভ্রান্তিকর বা ভুলত্রুটি হলে কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়ে থাকে ।

পুনরায় সতর্কতা। আমি জিগ্যেস করলাম, 'স্যার, আপনি আমার ট্রাইবুনাল কক্ষের কোনো পিস পড়েছেন কি ?’

তিনি হেসে বললেন, ‘প্রতিদিনের মতো আপনার রিপোর্টের ইংরেজি অনুবাদ এই আমার সামনেই রয়েছে।'

অর্থাৎ কোর্ট শুরু হবার আগেই ‘ট্রাইবুনাল কক্ষে'র অনুবাদ বিশেষ স্থান থেকে প্রতিদিনই সরকার পক্ষের প্রধান কৌসুলির দপ্তরে পৌছানো হয়। আবার কোর্ট বসার সময় হলো। দেশের একজন অতি বিশিষ্ট আইনজীবীর সাথে আমি কোর্ট কক্ষে প্রবেশের জন্য উঠে দাঁড়ালাম।

ঊনসত্তর সালে আন্দোলন যখন আরো তীব্র হয়ে উঠছিল এবং প্রতিদিনই রাজপথে আহত বা নিহত হবার খবর আসছিল, সে সময় আমাকে দ্বিতীয়বার মঞ্জুর কাদেরের কক্ষে ডেকে নেয়া হয়। এবার আমি অনেক সহজ এবং স্বাভাবিক ছিলাম । তিনিও হালকা সুরে কথা তুলে বললেন, ‘আপনাকে কঠিন পথে অগ্রসর হতে হচ্ছে। '

আমি বললাম, ‘সে কথা জেনেই আমি ‘ট্রাইবুনাল কক্ষে' লিখছি। বিচারকগণ যখন কোর্টে বসেন, তখনই সেটা আদালত। তাঁরা যখন কোর্ট ত্যাগ করেন, তখন নয়। অথবা অভিযুক্তদের কাঠগড়ায় আনার পর সাথে সাথেই বিচারকগণ

কক্ষে প্রবেশ করেন না । কোনো কোনো সময় তাঁদের কক্ষে পৌঁছাতে কয়েক মিনিট বিলম্ব হয়। আপনি বোধহয় লক্ষ্য করেছেন, বিচারকদের অনুপস্থিত থাকাকালীন সময়ে যা কিছু কক্ষে ঘটছে পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে আমি সেই সমস্ত ঘটনা থেকে কিছু কিছু অংশ 'ট্রাইবুনাল কক্ষে' উপস্থাপন করছি।'

মঞ্জুর কাদের মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনলেন এবং হাসিমুখে বললেন, 'এই বুদ্ধি আপনি কোথায় পেলেন ? আর কি করে জানেন যে, বিচারক না থাকলেও কোর্টের সময়কালীন বিষয়াদি সম্পর্কিত লেখা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে না?"

আমি : 'সাধারণ জ্ঞান থেকে ধরে নেয়া যায় যে, কোর্টের কোনো কোনো অংশ বিচারের ক্ষতি না করেও লেখা যায়। তবে একথা সত্যি যে, বিচারকদের অনুপস্থিতিকালীন কোনো রিপোর্ট সম্পর্কে কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় কি যায় না, সে সম্পর্কে আমি জানতাম না । '

মঞ্জুর কাদের : 'আমি আপনাকে নিরুৎসাহিত করছি না, ভয়ও দেখাচ্ছি না। বরং আমি মনে করি রিপোর্টারদের যদি ভাষার ওপর দক্ষতা থাকে এবং আইন প্রয়োগের সাধারণ নীতি তাঁর জানা থেকে, তবে ঐতিহাসিক মামলাগুলোর অনেক দিক আছে, যা লেখা সম্ভব।' আমি তার উৎসাহব্যঞ্জক কথা শুনে আশ্চর্য হলাম। এই শান্ত প্রকৃতির লোকটি স্বল্পভাষী এবং সমগ্র পাকিস্তানে একজন সুদক্ষ আইনজীবী। তিনি একবার পররাষ্ট্রমন্ত্রীও হয়েছিলেন। এই আইনজ্ঞ ও কূটনীতিকের মুখোমুখি তর্ক- বিতর্কের অবকাশ খুব কম। অতিরিক্ত কোনো কথা তাঁর মুখ দিয়ে বেরোয় না । আবার আমাদের ডাক পড়লো ট্রাইবুনালের দিকে। তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, "আপনি যে পন্থায় লিখছেন সেটা সঠিক পথ। তবুও মনে রাখবেন, সতর্কতার মার নেই । ' তখন ঢাকা শহর ও বাংলাদেশের সর্বক্ষেত্র এই মামলা প্রত্যাহার ও বন্দীদের মুক্তির দাবিতে অগ্নিময় হয়ে উঠেছিল । সে সময় শেষবারের মতো মামলার কোনো একটি তারিখে মঞ্জুর কাদেরের সাথে আমার তৃতীয়বার আলাপ হয়। তিনি মনে হলো উৎকণ্ঠায় ছিলেন। দু'এক কথার পরেই আমাকে ধন্যবাদ জানালেন। অর্থাৎ এই মামলার সরকারের কঠোর দৃষ্টির মধ্যেও ছিদ্র সন্ধানীরা আমার লেখায় আইন অতিক্রমকারী বাক্য বা শব্দ খুঁজে পান নি ।

এমনতর বহু ঘটনা ছিল যা রিপোর্ট করা হয় নি। অনেক তথ্য ছিল সরকারি ভাষ্যে, যা প্রকাশ করলে ক্ষতি হতো না। কিন্তু তখন ট্রাইবুনাল কক্ষে

পরিস্থিতিটা এমন ছিল যে, অনেককেই সেই অবস্থা ভীতিগ্রস্ত করে রেখেছিল। সেদিন জানতাম না যে, আন্দোলনের বহ্নিশিখায় ইসলামাবাদের ষড়যন্ত্রের এই মামলা ভস্মীভূত হয়ে গেছে। সেদিনও কোর্ট স্থগিত করা হয়—বিচার বন্ধ নয়।

বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, পুরনো অনেক রাজনীতিক এবং এই প্রজন্মের সন্তানেরা ভাষা আন্দোলনের পরেই বীরত্বপূর্ণ কাহিনীরূপে ঊনসত্তর সালের গণঅভ্যুত্থানের কাহিনী বলে থাকেন। কিন্তু উক্ত বিদ্রোহের কাহিনী তাঁরা জানেন না এবং যাঁরা জানেন তাঁরা উচ্চারণও করেন না। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিদ্রোহের ঘটনা আমাদের ইতিহাসে অতি গুরুত্বপূর্ণ। একে এড়িয়ে যে সমস্ত রাজনীতিবিদ গণঅভ্যুত্থান থেকে আমাদের আন্দোলনের কথা শুরু করেন, তারা রাজনৈতিক দিক থেকেই উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই ঘটনাটিকে এড়িয়ে গেছেন এবং যাচ্ছেন। এর অর্থ অবোধগম্য নয়।

ইতিহাসে সুস্পষ্ট যে, পূর্ব বাংলায় গণঅভ্যুত্থান ঘটেছিল বিদ্রোহের এই মামলার সূত্র ধরেই এবং শেখ মুজিবসহ অন্যদের মুক্তি ও মামলা প্রত্যাহারের দাবি উত্থাপনের ভেতর দিয়েই। পূর্ব নির্ধারিত হলেও সেই অভ্যুত্থানের প্রবাহে সত্তর সালের সাধারণ নির্বাচনে বাংলাদেশের গণতন্ত্রকামী মানুষের বিপুল বিজয় ঘটেছিল এবং আওয়ামী লীগ সেই বিজয়ের সিংহভাগ অর্জন করে। আবার শেষ পর্যন্ত সেই বিজয়কে কেন্দ্র করেই মুক্তিযুদ্ধের সূচনা। এর মধ্যবর্তী ইতিহাস সবারই সুস্পষ্টভাবে জানা আছে। ষাটের দশকের শেষভাগে সশস্ত্র বিদ্রোহের উদ্বোধকদের অবদানের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করলে, এই পুরোধাদের সৃষ্ট ইতিহাস থেকে প্রজন্মের সন্তানরা বঞ্চিত হবে এবং আমাদের বীরত্বপূর্ণ ইতিহাসের খণ্ডিত অংশ অকল্যাণই বহন করতে পারে। কারণ প্রকৃত ইতিহাস ফিনিক্স পাখির মতো বারবার ভস্ম থেকে উঠে আসে। তবুও আমি এখানে এই মামলার ব্যাপারে ঐতিহাসিকের ভূমিকা নিচ্ছি না।

বিশেষ ট্রাইবুনালে মামলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অভিযুক্ত ব্যক্তি শামসুর রহমানের (সি.এস.পি) সাথে আলাপ হচ্ছিল। প্রশ্ন করেছিলাম, কেন এই মামলা ও তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে প্রজন্মকে অন্ধকারে রাখা হচ্ছে অথবা গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না ? তিনি আমার সাথে এই ব্যাপারে অনেক আলাপের পর একটি কথাই কেবল উদ্ধৃত করতে অনুমতি দিয়েছেন, “তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। ঘটনাটা, বলতে পারো রাজনৈতিক।'

মামলার সময় গুলিবিদ্ধ ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক পরে একটি বৃহৎ

রাজনৈতিক দলের সাথে সংযুক্ত ছিলেন। গত ১৬ জানুয়ারি ১৯৯৪ ঢাকায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। এই অভিযুক্ত সাহসী ও অমায়িক ব্যক্তিকেও মৃত্যুর এক মাস পূর্বে একই প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলেছিলেন, 'রাজনৈতিক ধারায় কৌশলগত কারণে ইতিহাস অনেকভাবেই প্রবাহিত হয়—ভিন্ন পথও অবলম্বন করে। আপনি নিজেই এর উপসংহার টানুন। স্বাধীনতা অর্জনের এই বিদ্রোহ ও মামলা এদেশের রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন এনেছিল। মামলাটি সত্য হওয়ার পরও আমরা বোধগম্য কারণে পরবর্তীকালে নিশ্চুপ ছিলাম।'

অভিযুক্ত কর্পোরাল এ.বি.এম. আবদুস সামাদ বলেন, ‘শেখ সাহেবকে সরকার রাজনৈতিকভাবে শেষ করার জন্যই ‘ষড়যন্ত্রে'র কথা বলে এই মামলা দায়ের করে । পাকিস্তান আমাদের বিদ্রোহ করতে বাধ্য করেছিল। আমরা কোনো ষড়যন্ত্র করি নি । বিদ্রোহ করতে চেয়েছিলাম। পরবর্তীকালে সম্ভবত নানা রাজনৈতিক কারণে এই ঘটনার আলোচনা বন্ধ হয়ে যেতে থাকে ।

এই মামলায় বিবাদী পক্ষের অন্যতম কৌসুলি ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম (বর্তমানে গণফোরাম নেতা) একই প্রশ্নের জবাবে বলেন, সেই সময়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দ্রুত অনেকগুলো ঘটনা ঘটে যায় । লাহোরে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ প্রথম রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স আহ্বান করেন এবং শেখ সাহেবকেও সেখানে উপস্থিতির আয়োজন চলে। এরপরেই প্রচণ্ড গণবিক্ষোভের মুখে আদালত এই মামলা প্রত্যাহার করে এবং প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান জেনারেল ইয়াহিয়ার হাতে ক্ষমতা তুলে দেন । প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার এল.এফ.ও-এর মাধ্যমে নির্বাচন করেন। এ-সমস্ত রাজনৈতিকভাবে দ্রুত সংঘটিত ঘটনাবলির প্রচণ্ড একটি প্রভাব জনগণের ওপর ছিল। তারপরই মুক্তিযুদ্ধ ও বিজয় লাভ। সে কারণে এই মামলাটির সঠিক মূল্যায়ন যথাসময়ে হয় নি বলে আমার ধারণা । এখন এ ব্যাপারে মূল্যায়নের তথ্যাদি সংগ্রহ করা হতে থাকবে।

সামরিক কারাগারে আটকাবস্থায় হাবিলদারের গুলিতে নিহত অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হকের ভাই আমিনুল হক মামলায় একজন কৌসুলি ছিলেন। তিনি বর্তমানে এ্যাটর্নি জেনারেল। তিনি বলেন: ‘এই সমগ্র মামলার ঘটনাবলি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে উদ্দীপ্ত করে তোলে। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে এই সাহসী ব্যক্তিদের অকুতোভয় ভূমিকার প্রকৃত মূল্যায়ন এখনো হয় নি।' এ্যাডভোকেট হক তখন তাঁর ভাইয়ের হত্যাকারী হাবিলদার মঞ্জুর সার বিরুদ্ধে

এক টাকার প্রতীক মামলা করেছিলেন।

এই মামলার সময় তরুণ ব্যারিস্টার ও বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টের বিশিষ্ট কৌসুলি কে.জেড. আলম মনে করেন যে, এই গুরুত্বপূর্ণ মামলা ও তার প্রভাবকে পার্শ্ব প্রান্তে রাখা রাজনৈতিকভাবে প্রচণ্ড ভুল হয়েছে। তিনি বলেন, ৬-দফা আন্দোলনের এক পর্যায়ে এই মামলার পূর্ণ মূল্যায়ন হয় নি। তবে সে সময় রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ সহ কয়েকটি গুরুত্বমণ্ডিত ইতিহাস পর্যায়ক্রমে আমাদের আচ্ছন্ন করেছিল। বর্তমানে এর পুর্ণ মূল্যায়ন বাঞ্ছনীয় ।

রাজনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক মামলাটির অন্যতম অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্নেল (অবঃ) শওকত আলী, বর্তমানে সংসদ সদস্য (আওয়ামী লীগ) এবং মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদের চেয়ারম্যান বলেন, সরকার এই মামলা গণ অভ্যুত্থানের মধ্যে প্রত্যাহার করার পর নানা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা এবং নতুন রাজনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু হয়। বঙ্গবন্ধু জাতীয় বীররূপে আবির্ভূত হন। প্রথম পর্যায়ে অনেকের মনে অনেক অস্থায়ী ভয় ছিল। কিন্তু সত্তর সালের নির্বাচনের সময় আমাদের বক্তব্য সর্বজনীন রূপ নেয়। এই নির্বাচনের বিজয় একটি পার্টির ব্যাপক বিজয় ছিল না, এ ছিল বাঙালির বিজয়। ষড়যন্ত্রের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা ও বিজয় আমাদের বিশ্বের একটি স্বাধীন দেশে পরিণত করে।

তিনি মনে করেন, এভাবে একটির পর একটি ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক কারণে সাময়িককালের জন্যে এই মামলার জাতীয় গুরুত্ব সুস্পষ্টভাবে জনগণের কাছে পৌঁছনো যায় নি। ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, জনগুরুত্বপূর্ণ সাহসী ভূমিকা কোনো দিনই চাপা পড়ে থাকে না। আপন গতিতেই ইতিহাস চলমান। এই ইতিহাসও চলমান। বিলম্ব হলেও এই ইতিহাস পূর্ণভাবে রচনার সময় এখনো শেষ হয়ে যায় নি।

ট্রাইবুনাল কক্ষে

জুন-ডিসেম্বর ১৯৬৮

১৯৬৮ সালের জুন-ডিসেম্বর সময়কালে

আজাদ পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত

চিফ রিপোর্টারের বিশেষ কলাম

[আগরতলা মামলা চলাকালে দৈনিক আজাদ পত্রিকায় প্রতিদিন মামলার সওয়াল-জবাব ও ধারা বিবরণী বিস্তারিত রিপোর্ট করার পাশাপাশি চীফ রিপোর্টার ফয়েজ আমদ ট্রাইবুনাল কক্ষে' নামে একটি বিশেষ রিপোর্টও লিখতেন । পঁচিশ বৎসর আগে লেখা এই বিশেষ কলামগুলো লেখা হয়েছিল উক্ত পত্রিকার প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সাধুভাষায় । সেই সময় প্রবল আলোড়ন তোলা কলামগুলো ভাষাগত অথবা অন্য কোনোরকম পরিবর্তন ব্যতীত এখানে হুবহু পত্রস্থ হলো।]

প্রকাশক

ট্রাইবুনাল কক্ষে

২০ জুন, ১৯৬৮

'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' আরম্ভের প্রথম দিন গতকাল বুধবার অধিবেশন শুরু হইবার পূর্বে ট্রাইবুনালের কক্ষে এক নম্বর অভিযুক্ত ব্যক্তি শেখ মুজিবুর রহমান (পাজামা- পাঞ্জাবি পরিহিত) প্রথম আগমন করেন। তিনি কক্ষের মধ্যে অভিযুক্তদের জন্য নির্দিষ্ট 'আসামীর কাঠগড়ায়' প্রবেশ করিয়াই এডভোকেট, দর্শক, আত্মীয়স্বজন ও সাংবাদিকদের অভিবাদন জানান। তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠ ছিলেন, এমন কয়েকজন বিশিষ্ট এডভোকেট কাঠগড়ার নিকটে যাইয়া তাঁহার সহিত করদর্শন করেন এবং শেখ মুজিবও তাঁহাদের শুভেচ্ছা জানান। তিনি অভিযুক্তদের প্রথম সারিতে প্রথম আসনে বসেন। তাঁহার পরে অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তি আসেন।

ট্রাইবুনাল কক্ষটি দর্শক, এডভোকেট এবং দেশী ও বিদেশী সাংবাদিক দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। ট্রাইবুনাল কক্ষ ক্ষুদ্র হওয়ায় দর্শক ও এডভোকেটের সংখ্যা সীমিত করা হয়। কক্ষে প্রায় ২ শতটি আসনের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

ট্রাইবুনাল অধিবেশন অল্পক্ষণের জন্য মুলতবি করা হইলে শেখ মুজিব পুলিশ প্রহরাধীন থাকা অবস্থায় আসামীর কাঠগড়া পার হইয়া কক্ষের বাহিরে চলিয়া যান এবং ক্যান্টিনে চা পান করেন। তখন তিনি সহাস্যবদনে বন্ধু এডভোকেটদের সাথে কথা বলেন। তাঁহার বৃদ্ধ পতিা উপস্থিত ছিলেন। তিনি পুত্র ও কন্যার সাথে এক পর্যায়ে আলাপ করেন । অধিবেশন সমাপ্তির পর শেখ মুজিবের সাথে আলাপ করার জন্য কাঠগড়ার নিকট দর্শকগণ ব্যাপক ভিড় করে।

অধিবেশন শুরু হওয়ার পূর্বে অভিযুক্ত শামসুর রহমান সিএসপি ট্রাইবুনাল কক্ষস্থ 'আসামীর কাঠগড়ায়' উপস্থিত হইয়াই তাঁহার বড় ভাই প্রাদেশিক সাবেক উজিরে আলা আতাউর রহমান খানকে দেখিতে পান । জনাব আতাউর রহমান কাঠগড়ার নিকট আগাইয়া যান। অভিযুক্ত শামসুর রহমান লোহার শিকের ফাঁক দিয়া বড় ভাইকে হাত বাড়াইয়া পা ছুঁইয়া সালাম করেন। তাঁহার স্ত্রী প্রখ্যাত গায়িকা আফসারী খানম দর্শক হিসাবে কক্ষে উপস্থিত ছিলেন। অভিযুক্তদের কিছুসংখ্যক আত্মীয়স্বজন ট্রাইবুনাল কক্ষে আগমন করেন । তাহারা অভিযুক্তদের সাথে করমর্দন ও আলোচনা করেন।

ট্রাইবুনাল কক্ষে

২১ জুন, ১৯৬৮

ট্রাইবুনাল অধিবেশন শুরু হইবার দশ মিনিট পূর্বে অভিযুক্তদের কাঠগড়ায় আনয়ন করা হয়। পূর্বদিনের ন্যায় শেখ মুজিবুর সহাস্যবদনে কক্ষে প্রবেশ করেন। সঙ্গে সঙ্গে কক্ষে উপস্থিত দর্শক, কৌসুলি, সাংবাদিকগণ তাঁহাকে দেখিবার জন্য আগ্রহী হইয়া উঠেন। কিছুসংখ্যক এডভোকেট ও দর্শক আসন ছাড়িয়া তাঁহার নিকট গমন করেন । তিনি হাত উত্তোলন করিয়া উপস্থিত সকলকে অভিবাদন জানান । এই সময় প্রহরারত পুলিশ তাহাদের কর্তব্য পালনের চেষ্টা করেন। শেখ সাহেব এক নম্বর অভিযুক্ত ব্যক্তির আসনে যাইয়া বসেন।

প্রায় দেড় ঘণ্টা পর অধিবেশনের অল্পক্ষণের চা-বিরতির সময় দর্শকগণ ও তাহার আত্মীয়স্বজন কাঠগড়ার নিকট অস্বাভাবিক ভিড় জমায় এবং তাহারা শেখ মুজিবের সাথে কথা বলার ও করমর্দন করার জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠেন।

অধিবেশন সমাপ্তির পর শেখ মুজিবের নিকট দর্শক ও আত্মীয়স্বজন ভিড় করেন। তিনি অনেকের সাথে কথা বলেন। আরও কয়েকজন অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহাদের আত্মীয়ের সাথে অল্পক্ষণ কথা বলার সুযোগ পান।

ট্রাইবুনাল কক্ষে

২২ জুন, ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান ও একনম্বর অভিযুক্ত ব্যক্তি শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল শুক্রবার ও পূর্ববর্তী দুইদিনের ন্যায় সহাস্যবদনে ট্রাইবুনাল কক্ষে প্রবেশ করেন এবং কক্ষে উপস্থিত দর্শক সাধারণ ও আইনজীবীদের হস্ত তুলিয়া অভিবাদন জানান। তখনও ট্রাইবুনালের অধিবেশন শুরু হয় নাই।

গত দুই দিনে অভিযুক্তদের কক্ষের কাঠগড়ায় অভিযুক্তদের কড়া পুলিশ বেষ্টনীর মধ্যে আনা হয়। কিন্তু অভিযুক্তদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও দর্শকগণ পুলিশ কর্ডনের মধ্যেই তাহাদের সাথে করমর্দন করেন ও শুভেচ্ছা জানান ।

শেখ মুজিবের পুত্র, কন্যা ও তাঁহার স্ত্রী কক্ষে উপস্থিত ছিলেন। শেখ মুজিব আবক্ষ উচ্চ কাঠগড়ার রেলিং-এর পাশে দাঁড়াইয়া তাঁহার স্ত্রীর সাথে কয়েক মিনিটকাল আলাপ করেন।

অধিকাংশ অভিযুক্ত ব্যক্তিই আত্মীয়স্বজনের সাথে কথা বলার সুযোগ গ্রহণ করেন। ট্রাইবুনালের অধিবেশন আরম্ভ হইবার পূর্বে এবং শেষ হইবার পরেও অভিযুক্তগণ আত্মীয়স্বজনের সাথে কিছুক্ষণ কথা বলেন ।

অভিযুক্ত ক্যাপ্টেন হুদার বৃদ্ধা মাতা গতকাল পুত্রের বিচার দেখিতে গিয়াছিলেন। তাহার সাথে পুত্রবধূ ছিলেন । পুত্রকে স্পর্শ করিয়া নির্বাক মাতা মন্থর গতিতে ট্রাইবুনাল কক্ষ ত্যাগ করেন।

তিনজন সিএসপি অফিসারের (অভিযুক্ত) স্ত্রীগণ গতকালও ট্রাইবুনালের অধিবেশনের সময় উপস্থিত ছিলেন ।

ট্রাইবুনাল কক্ষে

৩০ জুলাই, ১৯৬৮

শেখ মুজিবুর রহমান পূর্বের ন্যায় সহাস্যবদনে বিশেষ ট্রাইবুনাল কক্ষস্থ অভিযুক্তদের কাঠগড়ায় উপস্থিত হন। ট্রাইবুনালের বিচারপতিগণ যে সময় আসন গ্রহণ করিতেছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার' সাথে জড়িত বলিয়া অভিযুক্ত শেখ মুজিবসহ পঁয়ত্রিশজন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কক্ষের পাশের দরজা দিয়া আবক্ষ উচ্চ রেলিংঘেরা কাঠগড়ায় আনা হয়। বৃটেনের প্রখ্যাত আইনজীবী মিঃ টমাস উইলিয়মস শেখ মুজিবের পক্ষে কৌসুলি নিযুক্ত হইয়া গত ২৫শে জুলাই ঢাকা পৌছিয়া থাকিলেও গতকাল সোমবার ট্রাইবুনাল কক্ষেই তিনি প্রথম তাঁহার মক্কেল শেখ মুজিবের সাথে সাক্ষাৎ করার সুযোগ পান। বেলা এগারটার সময় অল্পক্ষণের জন্য ট্রাইবুনালের অধিবেশন মুলতবি হইবার পর এবং বেলা একটার সময় অধিবেশন শেষে তিনি শেখ মুজিবের সাথে দুইবার কয়েক মিনিট আলাপ করেন ।

গতকালও শেখ মুজিবের সাথে করমর্দন করার উদ্দেশ্যে বিবাদী পক্ষের আইনজীবীগণ ও দর্শকদের মধ্যে অনেকে কাঠগড়ার নিকট অধিবেশনের বিরতির সময় ভিড় জমান। তাঁহার আত্মীয়স্বজন নিকটে যাইয়া আলাপ করেন।

বেলা এগারোটায় অধিবেশনের অল্পক্ষণের বিরতির সময় বিচারপতিগণ আসন

ত্যাগ করার পর মুহূর্তেই কক্ষের মধ্যেই অকস্মাৎপ্রতিবাদ ও গোলযোগের কণ্ঠ শোনা যায় । সেই সময় এক নম্বর রাজসাক্ষী লেঃ মোজাম্মেল হোসেন সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়াছিলেন । বিবাদী পক্ষের এডভোকেটগণ সমস্বরে উচ্চকণ্ঠে বলিতেছিলেন যে, "না, কাঠগড়ায় সাক্ষীর সাথে কথা বলিতে পারিবেন না।' এই সময় সাক্ষীর কাঠগড়ার নিকট ভিড় জমিয়া যায়। অভিযোগ করা হয় যে, সরকার পক্ষের জনৈক এডভোকেট বিচারপতিদের অনুপস্থিতির সময় কাঠগড়ায় সাক্ষ্যদানরত রাজসাক্ষী লেঃ মোজাম্মেলের সাথে কথা বলিয়াছেন । কাঠগড়ায় এই জাতীয় আলাপ আইনানুগ নহে বলিয়া তাঁহারা জানান । তাঁহারা মনে করেন যে, সাক্ষ্যদানের সময়কালে আলাপ করিবার সুযোগে অনেক সময় সাক্ষীকে পরামর্শ দেওয়া হইয়া থাকে ।

অবশ্য ঘটনা বেশিদূর অগ্রসর হয় নাই। ট্রাইবুনালের রেজিস্ট্রার জনাব মীর্জা আসিয়া গোলযোগের সময় দুই পক্ষের মধ্যে দাঁড়ান এবং সাক্ষী লেঃ মোজাম্মেলের সাথে কাহাকেও কথা বলার সুযোগদান না করার ব্যবস্থা করেন। এই সময় সরকার পক্ষের জনৈক এডভোকেটকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার কথা বলিতে শোনা যায়। বিরতির মুহূর্তে এই হট্টগোল ও কথা কাটাকাটির সময় কক্ষে পুলিশের আই.জি ও ঢাকার পুলিশ সুপারকে নিকটেই দেখা যায়।

কিন্তু মীর্জা সাহেবের আশ্বাসে আশ্বস্ত হইলেও বিবাদী পক্ষের কয়েকজন এডভোকেট সাক্ষীর সাথে যেন কেহ কথা না বলেন, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিবার জন্য বিরতির সর্বক্ষণ সাক্ষীর অদূরে অপেক্ষা করেন ।

ট্রাইবুনাল কক্ষে

৩১ জুলাই, ১৯৬৮

ট্রাইবুনাল কক্ষে ও বারান্দায় গত দুইদিন যাবৎ জনৈকা বৃদ্ধা মহিলাকে মলিন বদনে উপস্থিত থাকিতে দেখা যায় । তিনি কাহারও সাথে কথা বলেন না, কথা বলার মত ভাষা হয়তো তাঁহার নাই । তিনি চার নম্বর অভিযুক্ত ব্যক্তি জনাব সুলতানউদ্দিন আহমদের মাতা । বিরতির সময় ও অধিবেশন শেষে কাঠগড়ার রেলিং-এর কাছাকাছি পর্যন্ত যাইয়া কেবলমাত্র পুত্রের দিকে অপলক নেত্রে চাহিয়া থাকেন। নির্বাক তাঁহার কণ্ঠ!

আজ বুধবার যে সাক্ষীকে কাঠগড়ায় সাক্ষ্যদানের জন্য আনা হইবে, তিনি বৃদ্ধার জামাতা, সুলতানউদ্দিনের ভগ্নীপতি। একই মামলায় দুইজন

গ্রেফতার হন। বৃদ্ধার পুত্র এখন অভিযুক্ত এবং জামাতা কামালউদ্দিন এই মামলার দুই নম্বর সাক্ষী ।

শেখ মুজিবুর রহমান গতকালও ট্রাইবুনাল কক্ষে পূর্বের ন্যায় প্রশান্ত দৃষ্টি লইয়া উপস্থিত হন। বিরতি ও অধিবেশন শেষে তাঁহার সাথে আত্মীয়স্বজন ও বহু দর্শকবন্ধু সাক্ষাৎ করেন । তাঁহাকে কৌসুলি টমাস উইলিয়মস ও জনাব সালাম খানের সাথে কাঠগড়ার মধ্য হইতে বিরতির সময় মামলার কয়েকটি বক্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করিতে দেখা যায়।

ট্রাইবুনাল কক্ষে

১ আগস্ট, ১৯৬৮

'আমি নয়টি মাস একা রহিয়াছি—আজ আমি ওকে না লইয়া যাইব না।' গতকাল বুধবার বিশেষ ট্রাইবুনালের অধিবেশন শেষ হইবার পূর্ব মুহূর্তে দর্শকদের গ্যালারী হইতে জনৈকা ক্রন্দসী মহিলা সুউচ্চ কণ্ঠে উক্ত আবেগময় বাক্য উচ্চারণ করেন। তাঁহার কণ্ঠ সকলকে হতচকিত করিয়া দেয়।

চেয়ারম্যান বিচারপতি জনাব রহমান কক্ষে চিৎকার না করার জন্য বলেন এবং তিনি বিচারপতি জনাব মুজিবুর রহমানকে জিজ্ঞাসা করেন—কে এই মহিলা ?

'বৈরী' হিসাবে ঘোষিত সাক্ষী কামালউদ্দিনের স্ত্রী এই মহিলা। তিনি সেই সময় দর্শকের গ্যালারী হইতে বিচারপতিদের মঞ্চের দিকে আসিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু ট্রাইবুনাল কক্ষের অফিসারগণ তাহাকে অগ্রসর হইতে দেন নাই ।

মিসেস কামালউদ্দিনকে আর একবার বলিতে শোনা যায়, 'ওকে এখান হইতে লইয়া যাইতে চাই— তাহা না হইলে আমি যাইব না।'

জনাব সালাম খান এই সময় কামালউদ্দিনকে মুক্তিদানের জন্য আবেদন করিতেছিলেন। ট্রাইবুনাল তখন সাক্ষীর মতামত গ্রহণের জন্য প্রশ্ন করেন : আপনি সামরিক তত্ত্বাবধানে থাকিতে চাহেন, না বাড়ি যাইতে ইচ্ছুক।

কামালউদ্দিন : বাড়ি যাইতে চাই ।

ট্রাইবুনাল কক্ষে তখন গুঞ্জরন চলিতেছিল। নির্দেশ মোতাবেক কামালউদ্দিনের

জন্য কে মুচলেকা দিবেন তাহাই ছিল সবার চিন্তার বিষয়।

অপর এক বৃদ্ধা মহিলার কথা কেহ ভাবেন নাই—কেহ বিশেষভাবে তাহার প্রতি লক্ষ্যও করেন নাই। সাক্ষী কামালউদ্দিনের শাশুড়ি এই মহিলা চারি নম্বর অভিযুক্ত ব্যক্তি সুলতানউদ্দিন আহমদের মাতা ।

তিনি কাহারও সাথে কোন কথা বলেন নাই। তাহার চোখে অশ্রু ছিল না। তিনি চারি ঘণ্টাব্যাপী অধিবেশন চলাকালে অপলক নয়নে পুত্র সুলতানের দিকে চাহিয়াছিলেন। তাহার পাশেই সর্বদা বসিয়াছিলেন কন্যা মিসেস কামালউদ্দিন।

তাহার চোখের সামনেই জামাতা সাক্ষীর কাঠগড়ায় আতংকিত অবস্থায় প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন— ক্রন্দনরতা কন্যা তাঁহার পাশে। জামাতা কামাল অভিযুক্ত পুত্র সুলতানকে সনাক্ত করিতেছেন। জামাতা কামালউদ্দিনকে ‘বৈরী’ ঘোষণা করা হইয়াছে। ‘বিধ্বস্ত মানসিক' অবস্থার মধ্যে তিনি কৌসুলিদের প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। এ সমস্তই তাঁহার চোখের সামনে ঘটিতে থাকে।

কন্যার চিৎকার তাঁহাকে বিব্রত করে নাই। জামাতার মুক্তির নির্দেশ তাঁহাকে ব্যাকুল করে নাই ।

ট্রাইবুনালের অধিবেশন শেষে একে একে সকলেই চলিয়া যাইতে থাকেন। সুলতানের বৃদ্ধা মাতা মন্থরগতিতে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসেন— জনস্রোতে মিশিয়া যান।

জামাতার মুক্তির জন্য অপেক্ষা করেন নাই ।

ট্রাইবুনাল কক্ষে

২ আগস্ট, ১৯৬৮

শেখ মুজিবকে বহুদিন পর একবার দেখিবার জন্য গতকাল বৃহস্পতিবার একজন বৃদ্ধ রাজনীতিক ট্রাইবুনাল কক্ষে দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। শুভ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত বৃদ্ধ রাজনীতিক আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ দর্শকদের গ্যালারীতে চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন। তুলনামূলকভাবে কম বয়সের দর্শকদের কাছে তিনি পরিচিত নন।

এই বৃদ্ধের চোখে অশ্রু ছিল। অভিযুক্তদের কাঠগড়ায় শেখ মুজিবকে দেখিতে পাইয়া তিনি চঞ্চল হন নাই। দূর হইতে ‘মুজিবকে’ একনজর দেখিতেই শুধু

তিনি শহরের দূর প্রান্তে আসিয়াছিলেন ।

দীর্ঘদিনের ‘রাজনৈতিক বন্ধু' শেখ মুজিবুর তাঁহাকে অভিবাদন জানান ।

শেখ মুজিবকে গতকাল বিশেষ উৎফুল্ল দেখাইতেছিল। বিরতির সময় তিনি দর্শকদের মধ্যে বন্ধু ও কৌসুলিদের ডাকিয়া কথা বলিতেছিলেন।

ট্রাইবুনাল কক্ষে

আগস্ট, ১৯৬৮

বিশেষ ট্রাইবুনালের অধিবেশন প্রত্যেক দিন শেষ হইলে কক্ষের মধ্যে গুঞ্জরণ শুরু হয়—মুহূর্তের মধ্যে সেই গুঞ্জরন কোলাহলে পরিণত হইয়া পড়ে। এই কোলাহলের মধ্যে কৌসুলিদের ভিড়ের ফাঁকে সর্বজন পরিচিত একজন সিনিয়র কৌসুলি অভিযুক্তদের কাঠগড়ার দিকে যাইতেছিলেন ।

বাদী পক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব মঞ্জুর কাদের অভিযুক্তদের আবক্ষ রেলিং-এর নিকট সহাস্যবদনে উপস্থিত হইলেন। ‘ষড়যন্ত্র' করার অভিযোগে একনম্বর অভিযুক্ত ব্যক্তি শেখ মুজিবুর রহমান তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

শেখ মুজিবকে একনম্বর অভিযুক্ত ব্যক্তিরূপে চিহ্নিত করিয়া যে ‘ষড়যন্ত্রের' মামলা দায়ের করা হইয়াছে, পাকিস্তানের সাবেক পররাষ্ট্র উজির প্রখ্যাত আইনজীবী মঞ্জুর কাদের রাষ্ট্র কর্তৃক নিযুক্ত সেই মামলার প্রধান কৌসুলি ।

দীর্ঘদিন পর হয়তো তাঁহাদের মধ্যে সাক্ষাৎ হইল। রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁহারা পরস্পর বিরোধী নীতির অনুসারী ছিলেন। পাকিস্তানের বর্তমান শাসনতন্ত্র জনাব মঞ্জুর কাদেরই প্রকৃতপক্ষে রচনা করিয়াছেন বলিয়া তাহার বিরোধী রাজনীতিকগণ দাবি করেন। তাঁহাদের সম্পর্কের বাহ্যিক রূপ আন্তরিক। জনাব কাদের অভিযুক্ত শেখ মুজিবকে ‘শেখ সাহেব’ বলিয়া উল্লেখ করেন।

শেখ মুজিব তাঁহার নিকট পুনরায় কয়েকটি অভিযোগের কথা উল্লেখ করেন, অবশ্য এই অভিযোগ ও অসুবিধার কথা তিনি গতকাল অধিবেশনের প্রারম্ভেই ট্রাইবুনালকে জানাইয়াছিলেন। জনাব কাদের এই সমস্ত অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া ট্রাইবুনালে জানাইবার আশ্বাস দেন।

মামলার বাদী ও বিবাদী পক্ষের কৌসুলিদের মধ্যে হাস্য-কৌতুকের অবকাশ কম । গতকাল এমন একটি মুহূর্ত ছিল যখন দুই পক্ষের সিনিয়র কৌসুলিগণ

(তাঁহারা পাশাপাশি বসেন) হাস্যরসাত্মক আলাপ করার সুযোগ গ্রহণ করেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে ডুবিয়া থাকার ফাঁকে কয়েক মুহূর্ত অন্য বিষয়ে কথা বলার অবসর স্বাভাবিকভাবেই তাঁহাদের আকৃষ্ট করিয়াছিল। তবে আইনজীবীদের আলোচনা বুদ্ধিজীবীসুলভ ছিল।

ট্রাইবুনাল কক্ষে

৬ আগস্ট, ১৯৬৮

পরিচিত আদলের আকর্ষণ সর্বদা এড়ান যায় না । প্রিয়ভাষী জনাব এন.এ. রেজভীও গতকাল বিশেষ ট্রাইবুনাল কক্ষে তাঁহার একটি সুপরিচিত মুখমণ্ডলের আকর্ষণ এড়াইতে পারেন নাই ।

ট্রাইবুনালের অধিবেশন আরম্ভ হইবার পূর্বে তাঁহাকে কক্ষের অপরদিক হইতে দ্রুত অভিযুক্তদের কাঠগড়ার দিকে আগাইয়া আসিতে দেখা যায় । তিনি কাহার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য এত ব্যস্ততার সাথে অগ্রসর হইতেছিলেন ?

প্রধান অভিযুক্ত ব্যক্তি শেখ মুজিবের সাথে তিনি কাঠগড়ার বাহির হইতে কোলাকুলি করেন সহাস্যবদনে। তাহারা পরস্পরের কুশল জিজ্ঞাসা করেন। জনাব এন.এ. রেজভী কেন্দ্রীয় সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান ।

রাজনৈতিক নেতা শেখ মুজিব বা গোয়েন্দা প্রধান জনাব রেজভী কেহই কাহার পূর্ব পরিচয় (সে যেরকম শ্রেণীরই হোক) উপেক্ষা করিতে চাহেন নাই। তাঁহাদের সৌজন্যমূলক আলোচনা কক্ষে উপস্থিত প্রায় সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ট্রাইবুনালের অধিবেশন সমাপ্তির পর জনাব রেজভী পুনরায় শেখ মুজিবের নিকট আসেন। দর্শক ও বহু আইনজীবী বেষ্টিত শেখ মুজিবের নিকট আসিয়া তিনি পুনরায় তাঁহাকে শুভেচ্ছা জানাইয়া যান ।

গত দুইদিন যাবৎ ট্রাইবুনাল কক্ষে দর্শকের দুই চারিটি আসন খালি থাকিতেছে। হয় দর্শকের কার্ড পাইয়াও কেহ কেহ সকালবেলা উপস্থিত হইতে পারিতেছে না, নয়ত দর্শকদের আকর্ষণ কমিয়া আসিতেছে । এমনও হইতে পারে যে, দর্শনেচ্ছুক ব্যক্তিদের ভিড় কমে নাই—তাহারা হয়ত কর্তৃপক্ষের নিকট সঠিক পদ্ধতিতে আবেদন করিতে পারিতেছেন না। তদুপরি কোন কোন আইনজীবী নিষ্প্রয়োজনে ট্রাইবুনাল কক্ষে কম আসিতে শুরু করিয়াছেন।

ট্রাইবুনাল কক্ষে

৭ আগস্ট, ১৯৬৮

প্রখ্যাত বৃটিশ কৌসুলি মিঃ টমাস উইলিয়মস দুইদিন পর গতকাল মঙ্গলবার বিশেষ ট্রাইবুনালে উপস্থিত ছিলেন। গতকাল অধিবেশন বিরতির পর তিনি ট্রাইবুনাল কক্ষে প্রবেশ করেন।

অভিযুক্ত শেখ মুজিবুর রহমানের কৌসুলি মিঃ উইলিয়মসকে অধিবেশন শেষে শেখ মুজিবের সাথে মামলা সম্পর্কে কিছুক্ষণ আলাপ করিতে দেখা যায়। এই সময় আরও কয়েকজন কৌসুলি নিকটে আসিয়া শেখ মুজিবের সাথে করমর্দন করেন।

ট্রাইবুনালের অধিবেশন আরম্ভ হইবার পূর্বে (অভিযুক্তদের কয়েক মিনিট পূর্বে কক্ষে আনা হয়), কক্ষে বিরতির সময় এবং অধিবেশন সমাপ্ত হইলে অভিযুক্তদের আত্মীয়স্বজন দর্শকদের গ্যালারী হইতে নিজ নিজ আত্মীয়ের (অভিযুক্ত) সাথে কথা বলিতে চেষ্টা করেন । দূর হইতে হাত নাড়িয়া উচ্চকণ্ঠে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া অনেকে ক্ষান্ত হন । কিন্তু মহিলা দর্শকদের পক্ষে উচ্চকণ্ঠে কথা বলা সম্ভব হইয়া উঠে না।

জনৈক অভিযুক্ত ব্যক্তির স্ত্রীকে গতকাল অধিবেশন শেষ হইবার পর অস্বস্তির মধ্যে থাকিতে হয় । তিনি হয়ত ভাবিয়াছিলেন, গৃহে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে স্বামীর সাথে দিনের শেষ দেখার কথা বলিবেন। আইনের স্বাভাবিক বিধান অনুযায়ী অনুমতি ব্যতিরেকে কেহ অভিযুক্ত ব্যক্তির সাথে কথা বলিতে পারেন না ।

দর্শকের গ্যালারী হইতে তিনি হাত নাড়িতেছিলেন। যাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য তিনি চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন, তিনি তখন ব্যস্ত ছিলেন কৌসুলির সাথে আলোচনায় । অল্পক্ষণের মধ্যেই অভিযুক্তগণ কাঠগড়া হইতে বাহির হইয়া পাশের দরজা দিয়া চলিয়া যান—সেই অভিযুক্ত ব্যক্তিও তাদের মধ্যে ।

দর্শকগণ বাহির হইয়া আসেন কক্ষ হইতে—সকলে আলোচনায় মুখর। তাহাদের পাশ কাটিয়া জনৈকা মহিলা নীরবে ট্রাইবুনাল কক্ষ ত্যাগ করেন, রাস্তায় আসিয়া গাড়ির জন্য অপেক্ষায় থাকেন ।

ট্রাইবুনাল কক্ষে

৮ আগস্ট, ১৯৬৮

ট্রাইবুনাল কক্ষে সে সময় এক তরুণী বধূ একা বসিয়া- ছিলেন। তাঁহার এই আসনটি যেন নির্দিষ্ট। বেঞ্চের এই স্থানটি প্রত্যহ যেন তাঁহার জন্যই অপেক্ষা করে ।

ক্যাপ্টেন স্বামী যেন কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে প্রথমেই দেখিতে পান— ইহাই যেন তাঁহার কামনা । স্বামী অন্যতম অভিযুক্ত ব্যক্তি ।

প্রত্যহ তিনি দূর হইতে হাত নাড়িয়া স্বামীর সাথে কথা বলিতে চেষ্টা করেন— শুভেচ্ছা জানান। বেলা একটা পর্যন্ত ট্রাইবুনাল চলার পর যে যাহার পথে চলিয়া যান ।

টমাস উইলিয়মস গতকালও কাঠগড়ার নিকট দাঁড়াইয়া শেখ মুজিবের সাথে মামলা সম্পর্কে আলোচনা করেন । কয়েকজন কৌসুলি ও দর্শক শেখ সাহেবের নিকট যাইয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া শুভেচ্ছা জানান ।

বিরতির সময় অভিযুক্তদের কাঠগড়ার কোণে জনৈক অভিযুক্ত ব্যক্তি একজন কৌসুলির সঙ্গে বিশেষ সম্ভ্রমের সাথে আলাপ করিতেছিলেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি শামসুর রহমান সিএসপি। কৌসুলি পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক উজিরে আলা আতাউর রহমান খান— অভিযুক্ত শামসুর রহমানের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

ট্রাইবুনাল কক্ষে

৯ আগস্ট, ১৯৬৮

বিশেষ ট্রাইবুনালের বিরতির সময় একজন বিদেশী কক্ষে প্রবেশ করেন। পূর্ববর্তী কয়েকদিন সকলেই তাঁহাকে অন্য পোশাকে দেখিয়াছিলেন। তিনি গতকাল ট্রাইবুনাল কক্ষে সাধারণ সুট পরিধান করিয়া আসিয়াছেন । তিনি মিঃ টমাস উইলিয়মস। গতকাল তিনি কৌসুলির পোশাক পরিধান করেন নাই।

কক্ষে প্রবেশ করিয়াই তিনি সোজা অভিযুক্ত শেখ মুজিবের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার নিকট হইতে বিদায় নেন। তিনি বাদী ও বিবাদী পক্ষের কৌসুলি, উপস্থিত সাংবাদিক ও কয়েকজন অভিযুক্ত ব্যক্তির আত্মীয়ের সাথে সংক্ষিপ্ত আলাপে রত হন।

গতরাত্রে তিনি স্বদেশের পথে যাত্রা করিবার পূর্বে সকলের সাথে সাক্ষাতের

জন্য গিয়াছিলেন।

গত কয়েকদিন যাবৎ ট্রাইবুনাল কক্ষে দর্শকদের গ্যালারীর বেশ কিছু আসন শূন্য থাকে। ট্রাইবুনাল অধিবেশন আরম্ভ হইবার সময় কক্ষে যে ভিড় হইত, এখন আর ততটা ভিড় পরিলক্ষিত হয় না ।

যে কয়জন দর্শকের গ্যালারীতে উপস্থিত থাকেন তাহারা প্রায় সকলেই অভিযুক্তদের আত্মীয়—অনাত্মীয় দর্শকের সংখ্যা যে-কোন কারণেই হউক হ্রাস পাইয়াছে। অনেকে হয়ত দর্শকের কার্ড সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইতেছেন না, নতুবা দর্শকের আকর্ষণ কমিয়াছে ।

ট্রাইবুনাল কক্ষে

১০ আগস্ট, ১৯৬৮

ট্রাইবুনাল কক্ষে বিচারপতিগণ আগমনের পরও গতকাল প্রায় পাঁচ মিনিট জেরা আরম্ভ করিতে বিলম্ব হয়। সেই সময় বিবাদীগণের প্রধান কৌসুলি জনাব সালাম খান উপস্থিত ছিলেন না। তিনি কয়েক মিনিট বিলম্বে ট্রাইবুনাল কক্ষে প্রবেশ করেন।

গতকালও রাজসাক্ষী আমির হোসেনকে জনাব সালাম খানের জেরা করার কথা ছিল। সেই কারণেই তাঁহার অনুপস্থিতিতে জেরা আরম্ভ হইতে পারিতেছিল না। তাঁহার জন্য ট্রাইবুনালকে অপেক্ষা করিতে হয়।

অবশ্য তিনি দ্রুত কক্ষে প্রবেশ করিয়াই জেরা আরম্ভ করেন। পথে তাঁহার গাড়ি ট্রাফিক জামের মধ্যে আটকা পড়িয়াছিল বলিয়া জানা যায় ।

ট্রাইবুনাল কক্ষে

১৩ আগস্ট, ১৯৬৮

রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সকলের সাথেই সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক রাখার একটা প্রচেষ্টা থাকে এবং তাঁহাদের সেই প্রচেষ্টা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভ্যাসে পরিণত হয় । আওয়ামী লীগের সভাপতি অভিযুক্ত শেখ মুজিবুর রহমানও ব্যতিক্রম নহেন। তাঁহার ক্ষেত্রে এই সম্পর্ক রাখার ব্যাপারটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। শুধু তাহাই নহে, তিনি অনেক সময় উপযাচক হইয়া কথা বলিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না ।

বিশেষ করিয়া তিনি যে অবস্থাতেই থাকেন না কেন, পরিচিত ব্যক্তিদের ভুলিতে পারেন না—এই কথাই তাঁহার আলাপী চরিত্র হইতে প্রকাশ পায়।

গতকাল ট্রাইবুনালের অধিবেশন সমাপ্তির পর শেখ মুজিব চিরদিনের অভ্যাস অনুযায়ী একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সাথে আলাপের জন্য অভিযুক্তদের কাঠগড়ার মধ্যে আগাইয়া আসেন। তিনি রাষ্ট্রের পক্ষে প্রধান কৌসুলি জনাব মঞ্জুর কাদের। এই সময় জনাব কাদের নিজের আসন হইতে উঠিয়া বিবাদী পক্ষের কৌসুলিদের সম্মুখের সারিতে আসিয়াছিলেন কথা বলিতে—-হয়ত কোন বিশেষ কথা ।

অভিযুক্তদের কাঠগড়ার পাশেই বিবাদী পক্ষের কৌসুলিদের আসন। নিকটেই শেখ মুজিবকে দেখিয়া তিনি কুশল জিজ্ঞাসা করেন—'কেমন আছেন ? ভাল তো?'

সেই পুরাতন অভ্যাসে শেখ মুজিবের মুখে স্বাভাবিক হাসি ফুটিয়া উঠে। তিনি বলেন, 'ধন্যবাদ। কথা আছে। কাল বলিব।'

তখন আর সময় ছিল না—শেখ মুজিবকে অন্যদের সাথে গাড়িতে উঠিতে হইবে। অমায়িক মঞ্জুর কাদের তাঁহার কথার উত্তর দিবার সুযোগ পান নাই।

ট্রাইবুনাল কক্ষে

১৪ আগস্ট, ১৯৬৮

বিবাদী পক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব সালাম খান গতকাল ট্রাইবুনাল চলাকালে বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব মঞ্জুর কাদেরের ব্যবহার ও সদ্‌গুণের প্রশংসা করেন। তিনি একপর্যায়ে সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, জনাব মঞ্জুর কাদেরের ব্যক্তিগত গুণাবলী সম্পর্কে আমি সচেতন। তিনি বলেন, কোর্টের বাহিরে বন্ধুমহলে আলোচনাকালে আমি তাঁহার সৎ গুণাবলীর প্রশংসা করি ।

তিনি এই প্রশংসা করেন বিরতির পর ট্রাইবুনালের অধিবেশন আরম্ভ হইবার সময় । এই সময় জনাব কাদের রাজসাক্ষী আমির হোসেনের কোর্টের পার্শ্ববর্তী একটি কক্ষে প্রবেশের ব্যাপারে বিবাদী পক্ষের বক্তব্যের জবাব দিতে চাহেন ।

গতকাল রাজসাক্ষীর জেরা শুরু হয় তাহার একটি কক্ষে প্রবেশের প্রশ্ন লইয়া। জনাব সালাম খান তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, রাজসাক্ষী কোর্ট কক্ষে

আনার পূর্বে পার্শ্ববর্তী একটি দালানের কক্ষে তিনি গিয়াছিলেন কিনা এবং কেন গিয়াছিলেন।

উত্তরে রাজসাক্ষী আমির হোসেন জানান যে, তিনি উক্ত দালানে বাথরুমে গিয়াছিলেন এবং উক্ত দালানে বাদীপক্ষ বসেন কিনা তিনি জানেন না। গতকাল তিনি বাথরুমে গেলে উক্ত কক্ষে কাহাকেও দেখেন নাই বলিয়া জানান।

এই সমস্ত প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে জনাব মঞ্জুর কাদের বলেন যে, বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলির বসিবার ঘর উক্ত দালানে অবস্থিত। সেইজন্য তাহাকে উক্ত কক্ষে বসিতে হয়। যদি সন্দেহ হয়, তবে বিবাদী পক্ষ রাজসাক্ষী বাথরুমে যাইবার সময় লক্ষ্য রাখিতে পারেন ।

এই সময় জনাব খান জনাব কাদেরের প্রশংসা করেন।

গতকাল ট্রাইবুনাল কক্ষে দর্শকদের ভিড় অত্যন্ত কম দেখা যায়। দুই পক্ষের কৌসুলিগণ, অভিযুক্তদের কয়েকজনের আত্মীয়-আত্মীয়া এবং কার্যরত সরকারী অফিসারগণই প্রধানত উপস্থিত ছিলেন।

ট্রাইবুনাল কক্ষে

১৬ আগস্ট, ১৯৬৮

স্থান : বিশেষ ট্রাইবুনাল কক্ষ ।

সময় : সকাল এগারটা তিন মিনিট। বৃহস্পতিবার । অধিবেশন বিরতি ঘোষণার পর ।

পরিবেশ : অভিযুক্তগণ স্ব-স্ব আসন ছাড়িয়া রেলিংঘেরা কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান। বিবাদী পক্ষের কৌসুলিগণ কাঠগড়ার নিকট নিজ নিজ অভিযুক্ত মক্কেলদের সাথে আলোচনায় রত। দর্শক গ্যালারী ও এডভোকেটদের আসনের মধ্যবর্তী এলাকায় ইউনিফর্মধারী পুলিশের সারি। এই সারির সম্মুখে অভিযুক্তদের নিকট আত্মীয়-আত্মীয়াগণ দাঁড়াইয়া আছেন। বাহির ও অভ্যন্তরে মৃদু গুঞ্জন। (এমন সময় একটি সংলাপের কিয়দংশ)।

জনৈক পুলিশ : না, এদিকে নয়। (তিনি এক ভদ্রলোককে বাধা দেন—প্যান্ট ও শার্ট পরিহিত) ।

ভদ্রলোক : (বাধা পাইয়া) কেন ?

পুলিশ : না, যেতে পারবেন না ।

ভদ্রলোক : (মহিলাদের সারির নিকট হইতে অদূরে অভিযুক্তদের কাঠগড়ার নিকট যাইতে চাহিয়া) কেন, বাধা কেন ? সবাই যাইতেছে।

পুলিশ : তাঁহারা উকিল ।

ভদ্রলোক : আমাকে চেন না ?

পুলিশ : না, দর্শকদের যাওয়া মানা ।

ভদ্রলোক (অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিয়া) কেন যাব না। আমাকে চেন না ? বলিতে হইবে ? আমি কে ?

পুলিশ : (দৃঢ়তার সাথে) না, চিনি না ।

ভদ্রলোক : (কিছুটা ক্রুদ্ধ, কিছুটা ক্ষুব্ধ হইয়া) কি কি কি ? চিন না। বলিতে হইবে! বলিতে হইবে ?

(এই সময় পুলিশ একটু বিব্রত হইয়া উঠিয়াছেন –) ।

ভদ্রলোক : (পুনরায়) বলিতে হইবে? আমি, আমি—আমি মানে আমি ! চিনিলে এখন, চিনিলে?

(পুলিশ যেন এবার তাহার সাংকেতিক ধমক চিনিতে পারিয়াছেন—

ভদ্রলোক দ্রুত কাঠগড়ার দিকে আগাইয়া গেলেন। কিন্তু অভিযুক্তগণ ইতিমধ্যে কক্ষ ছাড়িয়া বিশ্রামের জন্য অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন ।

* * *

দশটা দশ মিনিটের সময় গতকাল অকস্মাৎ ট্রাইবুনাল কক্ষের বাতি নিভিয়া যায় - সেই সময় অধিবেশন চলিতেছিল। প্রায় দুই মিনিট কাল অধিবেশনের কাজ ব্যাহত হয়।

* * *

গতকাল বিরতির অল্প পূর্বে ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি জনাব রহমান বিবাদী পক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব সালাম খান উপস্থিত আছেন কিনা জানিতে চাহেন। জনাব খান তাঁহার জেরা অসমাপ্ত রাখিয়া ইতিপূর্বে কোর্টের অনুমতি লইয়া বাহিরে গিয়াছিলেন । সেই সময় খান বাহাদুর নাজিরুদ্দিন রাজসাক্ষীকে জেরা করিতেছিলেন। তাঁহার জেরার পর জনাব খান জেরা করিবেন বলিয়া মনে হইতেছিল। বিচারপতি রহমান জনাব খানকে ডাকিয়া আনার জন্য বলেন। ব্যারিস্টার আলম বাহির হইয়া ফোন করেন এবং কোর্টে জানান যে, তিনি ফিরিতেছেন। জনাব খান বিরতির সময় প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু অধিবেশন শেষ হওয়া পর্যন্ত জনাব আতাউর রহমান খান জেরা করেন।

ট্রাইবুনাল কক্ষে

১৭ আগস্ট, ১৯৬৮

প্রত্যহই বিশেষ ট্রাইবুনালের অধিবেশন শেষে অভিযুক্তদের আত্মীয়-আত্মীয়াগণ পাঁচ-সাত মিনিট কক্ষে অপেক্ষা করেন। তাহারা অভিযুক্ত আত্মীয়দের আরও কয়েক মিনিট দেখিতে চাহেন—যদি একবার কথা বলা যায়, এই আশায় ।

দর্শকদের গ্যালারীতে বসিয়া তাহারা অভিযুক্তদের কাঠগড়ায় আত্মীয়দের দেখিতে পান। কয়েক গজ পেছনে বসিয়াও তাহারা যেন বহু দূরে রহিয়াছেন। কিন্তু অধিবেশন শেষ হইবার পর তাহারা এই বাস্তব অবস্থা যেন স্বীকার করিতে চাহেন না

বিচারপতিগণ কক্ষ ত্যাগ করিবার সাথে সাথে ডিউটিরত পুলিশ কর্মচারিগণ স্বাভাবিক নিয়মেই দর্শক ও অভিযুক্তদের কাঠগড়ার মধ্যবর্তী স্থানে আসিয়া সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়ান । কোন অনুমতি নাই, সাক্ষাৎ বা কথা হইতে পারিবে না ।

কিন্তু গতকাল যে তিনজন মহিলা অভিযুক্ত আত্মীয়কে দেখিতে কক্ষে উপস্থিত ছিলেন, (হয়ত সুদূর গ্রাম হইতে আসিয়াছেন) তাহারা এই নিষেধাজ্ঞা জানেন না। আত্মীয়ের সাথে কথা বলা যাইবে না কেন ? এমন একটা প্রশ্ন তাহাদের উৎকণ্ঠার মধ্যে স্পষ্ট হইয়া উঠে । পুলিশের ব্যারিকেডের (সারির) বিপরীত দিক হইতে তাহারা অস্পষ্ট স্বরে কাহাকে ডাকেন, হাত নাড়েন ।

কোন মুহূর্তে তাহাদের আত্মীয় কাঠগড়া হইতে অন্যদের সাথে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহারা তিনজন তখনও দাঁড়াইয়া ছিলেন । তাহারা যখন কক্ষ ত্যাগের জন্য ফিরিয়া দাঁড়ান, তখন কক্ষে আর কোন দর্শক ছিলেন না।

ট্রাইবুনাল কক্ষে

১৮ আগস্ট, ১৯৬৮

গত কিছুদিন যাবৎ ট্রাইবুনাল কক্ষে দর্শকের সংখ্যা কমিয়া আসিতেছিল।

গতকাল শনিবার কৌসুলিদের সংখ্যাও হ্রাস পায় ।

ট্রাইবুনালের অধিবেশন আরম্ভ হইবার সময় হইতে দর্শক ও কৌসুলিদের অস্বাভাবিক ভিড় ছিল। সেই সময় বহুসংখ্যক দর্শক কক্ষে আসনের অভাবে বিলম্বে প্রবেশপত্র পাইয়াছেন। তখন কৌসুলিদের স্থান সংকুলান হইতেছিল না ।

এমনকি কোন কোন কৌসুলি স্থানাভাব সম্পর্কে অভিযোগও করিয়াছিলেন। কৌসুলিদের এলাকায় চেয়ার থাকিলেও চেয়ার রাখিবার স্থান ছিল না । বাদী পক্ষের জন্য নির্দিষ্ট এলাকা বিবাদী পক্ষের কৌসুলিদেরও বসিতে দেখা যায়। দ্বিতীয় সারি হইতে কৌসুলিদের সম্মুখে কাগজপত্র রাখার জন্য স্থানাভাবের দরুন লম্বা বেঞ্চও ছিল না।

কিন্তু বর্তমানে যে-কোন কারণেই হোক প্রকৃত দর্শক নাই বলিলেই চলে। দর্শকদের গ্যালারীতে কেবলমাত্র অভিযুক্তদের কয়েকজন স্ত্রী ও আত্মীয় প্রধানত বসেন। তাহাদের পেছনের সারিগুলি কয়েকদিন যাবৎ প্রায় শূন্য পড়িয়া থাকে। অবশ্য সরকারী কর্মচারিগণ সেখানে বসেন ।

কৌসুলিদের (বিবাদী পক্ষের) এখন আর কোন স্থানাভাবের অভিযোগ নাই। বিলম্বে পৌছাইলেও তাঁহারা বসিবার স্থান লাভ করেন। তাঁহাদের সম্মুখের সারিগুলির সাথে লম্বা বেঞ্চ লাগান সম্ভব হইয়াছে –কারণ ভিড় কম। তাঁহাদেরও পিছনের দিকের কয়েকটি সারি শূন্য থাকিতেছে।

সাংবাদিকদের স্থান সংকুলান সম্পর্কিত চিঠি লেখালেখি ও আলোচনা হইয়াছিল। প্রথম দিকে বিদেশী সাংবাদিকদেরও ভিড় হইতে থাকে। কিন্তু এখন কোন সাংবাদিক অতি বিলম্বে গেলেও নির্দিষ্ট বিশেষ স্থানে বসিতে পারেন।

তাঁহাদের এলাকায় নির্দিষ্ট আসনেরও কয়েকটি পড়িয়া থাকে। কয়েকদিন পর বিদেশী সাংবাদিকগণও দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। বিদেশী প্রতিষ্ঠানের জন্য কর্মরত পাকিস্তানী সাংবাদিকগণও এখন আর উপস্থিত থাকার ব্যাপারে ততটা উৎসাহী নহেন ।

ট্রাইবুনাল কক্ষে

২৩ আগস্ট, ১৯৬৮

বিশেষ বিশেষ পরিবারের মহিলা দর্শকদের বসিবার জন্য বিশেষ ট্রাইবুনাল কক্ষে বিশেষ ধরনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে কি ? গত ২১শে আগস্ট ট্রাইবুনাল অধিবেশনের বিরতির সময় চা কাউন্টারে অনেকেই এই প্রশ্ন করেন । এই প্রশ্ন প্রথম শোনা যায় অন্যান্য মহিলা দর্শকদের নিকট হইতে । সেদিনই দুইজন মহিলা দর্শক কক্ষে আসেন। দর্শকদের গ্যালারীর মধ্য দিয়াই তাহারা কক্ষে প্রবেশ করেন। কিন্তু সেখানে তাহারা বসেন নাই। তাঁহাদের পথ দেখাইয়া লইয়া যাওয়ার জন্য দুইজন আগাইয়া আসেন। বাদীপক্ষের কৌসুলিদের পিছনে সাংবাদিকদের জন্য নির্দিষ্ট বিকল্প স্থানে উক্ত দুইজন মহিলাকে লইয়া যাওয়া হয় । তাঁহারা (হয়তো দুইটি বৃহৎ শিল্পপতি পরিবারের দুহিতা) উক্ত স্থানে চেয়ারে বসেন।

কয়েকজন অভিযুক্ত ব্যক্তির স্ত্রী ইহাকে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । অভিযুক্তদের আত্মীয়গণ দর্শকদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানেই বসেন— তাহারা অন্য কোন গ্যালারীতে যাইতে অনুমতি পান না। লম্বা বেঞ্চের উপর বসিবার স্থান। দীর্ঘ চারি ঘণ্টা কাল তাঁহারা বেঞ্চের উপর বসিয়া কাঠগড়ায় অভিযুক্ত আত্মীয়দের দেখার চেষ্টা করেন।

বিরতির সময় (বিচারপতিগণ থাকেন না) ইউনিফর্ম পরা পুলিশ সারিবদ্ধ হইয়া মহিলা দর্শকদের মুখোমুখি ত্বরিত আসিয়া দাঁড়ান। ফলে অভিযুক্তদের আত্মীয় ও স্ত্রীগণ বিরতির সময়ও তাহাদের দেখিতে অনেক ক্ষেত্রেই সক্ষম হন না ।

বিরতির সময় মহিলা দর্শকদের বিশ্রামাগারের ব্যবস্থা করা হয় নাই । তাহারা কোথাও বসিয়া এক কাপ চাও খাইতে পারে না বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন। জনৈক অভিযুক্ত ব্যক্তির তরুণী স্ত্রী বলেন যে, আমরা উপেক্ষার মধ্যে চারি ঘণ্টা কাটাই। সেদিন তাঁহারা বিবাদী পক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব সালাম

খানের নিকট তাঁহাদের অভিযোগ জানান । অধিবেশন চলাকালে ট্রাইবুনাল কক্ষে প্রায়ই গুঞ্জন ধ্বনি শোনা যায়। অনেক ক্ষেত্রে চাপা গলায় আলাপের কণ্ঠ ভাসিয়া আসে। কেউ কাহারও হাসি অনুকরণ করিতেছেন। একদিন বিড়ালের ডাক শুনিয়া অনেকে চমকিয়া উঠিয়াছিলেন। এই অবাঞ্ছিত পরিবেশে অনেক সময়ই জেরার প্রশ্নোত্তর সঠিকভাবে শোনা যায় না ।

গতকাল বিচারপতি মুজিবুর রহমান অধিবেশন চলিবার সময় এই জাতীয় গুঞ্জন মুখর পরিবেশের মধ্যে একবার রাগিয়া উঠেন। তিনি বলেন, (সাংবাদিকদের দেখাইয়া) এই ভদ্রলোকগণ ছাড়া কক্ষে সবাই কথা বলিতেছেন। রোজই এই ব্যাপার ঘটে। কক্ষের মধ্যে নীরবতা বিরাজ করিতেছে না। ইহার ফলে কোর্টের কাজে ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে।

তাহার কথার পর নীরবতা ফিরিয়া আসে।

কিছুক্ষণ পর পুনরায় কক্ষে গুঞ্জন শোনা যায়। বিচারপতি রহমান এইবার বাধা দেন । তিনি সকলকে উদ্দেশ করিয়া বলেন, অনুগ্রহ করিয়া কথা বলিবেন না আপনারা ।

পুনরায় কক্ষে নীরবতা বিরাজ করে।

মাত্র ষোল মিনিটকাল অধিবেশন চলিবার পর গতকাল পুনরায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হইয়া যায়। ফলে বাতি, ফ্যান ও এয়ার কন্ডিশনার ছাড়াই অধিবেশনের কাজ চালাইতে হয়। অন্ধকার কক্ষের জানালা-পর্দা সরাইয়া দিতে হয়। তিন মিনিট কাল পর্যন্ত কক্ষে আলো ছিল না : আট মিনিট পর এয়ার কন্ডিশনার পুনরায় চালু হয়। অধিবেশন কক্ষে বিদ্যুৎ বিভ্রাট ইহাই প্রথম নহে ।

ট্রাইবুনাল কক্ষে

২৪ আগস্ট, ১৯৬৮

প্রথম দিন হইতেই বিশেষ ট্রাইবুনালের অধিবেশনে ভাবগম্ভীর পরিবেশ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই পরিবেশের মধ্যেও গত কিছুদিন যাবৎ রুচি ও শালীনতামণ্ডিত হাস্যরসের সৃষ্টি হইতেছে। গতকাল বিবাদী পক্ষের কৌসুলি জুলমত আলী খান তিন নম্বর রাজসাক্ষী শামসুদ্দিন আহমদকে জেরা করিতেছিলেন। একপর্যায়ে তিনি কর্পোরাল সিরাজুল ইসলাম ১৯৬৭ সালে বিমান বাহিনীতে কোথায় কাজ করিতেন সেই সম্পর্কে জানিতে

চাহিয়া বিভিন্নভাবে প্রশ্ন করেন কিন্তু তিনি সঠিক উত্তর পাইবার আশায় সংশ্লিষ্ট অফিসে কম্পিউটার সেকশনের প্রশ্ন তুলেন। রাজসাক্ষী ইহাকে ‘গোপনীয় তথ্য’ বলিয়া উত্তর দানে বিরত থাকেন।

এই সময় বিচারপতি জনাব মুজিবুর রহমান বলেন, কোন একটি কম্পিউটারের কাছে গিয়া বোতাম টিপেন সঠিক উত্তর পাইবেন ।

তাহার মন্তব্যে কক্ষের সবাই সশব্দে হাসিয়া উঠেন ।

গত বৃহস্পতিবার ডক্টর আলরাজী তিন নম্বর রাজসাক্ষীকে জেরা করার সময় যুদ্ধ ও সামরিক বাহিনী সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিতে বলিয়া প্রশ্ন করেন । তাঁহার প্রশ্নগুলি দ্রুত আসিতেছিল।

এক পর্যায়ে তিনি ‘ফ্রন্টাল এ্যাসন্ট' বা মুখোমুখি আক্রমণ করার অর্থ রাজসাক্ষী কি বুঝিতে পারেন, তাহা জিজ্ঞাসা করেন।

বিচারপতি এস.এ রহমান মন্তব্য করেন, ‘আপনি এখন যাহা করিতেছেন তাহাই ফ্রন্টাল এ্যাসন্ট।' কক্ষের সকলে হাস্যরোলের মধ্যে এই মন্তব্যের স্বাদ গ্রহণ করেন ।

ট্রাইবুনাল কক্ষে

২৭ আগস্ট, ১৯৬৮

বিশেষ ট্রাইবুনালের কক্ষে গতকাল সোমবার আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। অবশ্য তাহারা বিভিন্ন মর্যাদায় কক্ষে আসন গ্রহণ করেন। গতকালই প্রথম অধিবেশন কক্ষে আওয়ামী লীগ সদস্যদের এত বেশি সমাবেশ পরিলক্ষিত হয় ।

দর্শকদের গ্যালারীতে যিনি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তিনি হইতেছেন একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সময়ে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা মিসেস আমেনা বেগম। তাঁহার পর সম্প্রতি সাধারণ সম্পাদকের অস্থায়ী দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী এম.এন.এ। তিনিও গতকাল দর্শকের গ্যালারীতে ছিলেন।

আওয়ামী লীগের প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান কক্ষে উপস্থিত ছিলেন এক নম্বর অভিযুক্ত ব্যক্তি হিসাবে অভিযুক্তদের কাঠগড়ায়। রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর

ও অনান্যদের এই মামলায় বিবাদী পক্ষের প্রধান কৌসুলি আবদুস সালাম খানও আওয়ামী লীগের একজন বিশিষ্ট নেতা। আওয়ামী লীগের সাবেক সহ-সভাপতি ও আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে প্রাদেশিক উজিরে আলা জনাব আতাউর রহমান খান, আওয়ামী লীগ নেতা ও সাবেক কেন্দ্রীয় উজির জনাব জহীরউদ্দিন বিবাদী পক্ষের কৌসুলি হিসাবে প্রত্যহ ট্রাইবুনাল কক্ষে উপস্থিত থাকেন । গতকাল তাহাদের সাথে অন্যান্য দিনের ন্যায় আরও কয়েকজন আওয়ামী লীগ সমর্থক কৌসুলি ছিলেন।

সাক্ষীর কাঠগড়ায় রাজসাক্ষীরূপে যিনি গতকাল উপস্থিত ছিলেন, তিনি চট্টগ্রাম শহর আওয়ামী লীগের সাবেক সহ-সভাপতি ডঃ সায়েদুর রহমান। শুধু তাহাই নহে গতকাল ট্রাইবুনালের কার্যবিবরণীতে বিভিন্ন পর্যায়ে আওয়ামী লীগের নামোল্লেখিত হইয়াছে ।

ট্রাইবুনাল কক্ষে

২৮ আগস্ট, ১৯৬৮

অভিযুক্তদের আত্মীয়গণ এখন হইতে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সহজভাবে নিজ নিজ অভিযুক্ত আত্মীয়ের সাথে কথা বলার সুযোগ পাইবেন। ইতিপূর্বে তাহারা দর্শকের গ্যালারী হইতে দূরে বসিয়া অভিযুক্ত আত্মীয়দের দেখিতেন । গত কিছুদিন যাবৎ বিরতি এবং অধিবেশন শেষে পুলিশ সারিবদ্ধভাবে তাঁহাদের সম্মুখে দ্রুত আসিয়া দাঁড়াইতেন। ইহার ফলে কথা বলা দূরের কথা, দূর হইতে অভিযুক্তদের পর্যন্ত দেখা কষ্টকর ছিল।

বিবাদী পক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব সালাম খান গতকাল অধিবেশন সমাপ্তির সময় কোর্টের নিকট একটি আবেদন জানান। তিনি বলেন, অভিযুক্তদের স্ত্রীগণ, বিশেষ করিয়া তরুণী স্ত্রীগণ দূরে বসিয়া থাকেন প্রত্যহ। তাঁহারা অভিযুক্তদের সাথে কথা বলিতে পারেন না। এমনকি নিকট হইতেও স্ব-স্ব স্বামীকে দেখিতে সুযোগ পান না ।

তিনি বিশেষ করিয়া তরুণী স্ত্রীদের স্ব-স্ব স্বামীর কাছাকাছি আসিবার সুযোগ দিতে অনুরোধ জানান ।

বিচারপতি এস.এ. রহমান উক্ত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মহিলা দর্শকদের (আত্মীয়া) সুযোগদানের নির্দেশ দেন ।

গতকাল অধিবেশন শেষ হইবার সাথে সাথে অভিযুক্তদের স্ত্রীগণ ও কয়েকজন আত্মীয়া কাঠগড়ায় রেলিং-এর পাশে যাইতে সুযোগ লাভ করেন। তাহারা অভিযুক্তদের সাথে কিছুক্ষণ আলাপ করিতেও সমর্থ হন।

ট্রাইবুনাল কক্ষে এই প্রথম অভিযুক্তদের আত্মীয়গণ অভিযুক্তদের সাথে সরাসরি সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করিলেন।

ট্রাইবুনাল কক্ষে

২৯ আগস্ট, ১৯৬৮

বাদী পক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব মঞ্জুর কাদের সর্বদাই সময় সম্পর্কে সচেতন এবং তিনি প্রত্যহই ট্রাইবুনালের অধিবেশন আরম্ভ হইবার পূর্বে কক্ষে উপস্থিত হইয়া থাকেন। ট্রাইবুনালের অধিবেশন শুরু হইবার প্রথম দিন হইতে তিনি তাঁহার নির্দিষ্ট আসনে যথাসময়ে আসিয়া বসেন।

গতকালই প্রথম তাঁহাকে অধিবেশন আরম্ভ হইবার সময় কক্ষে উপস্থিত দেখা যায় নাই ।

যে-কোন কারণেই হোক তিনি অধিবেশনের প্রথম পঁচিশ মিনিট উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার এই আকস্মিক অনুপস্থিতি সংশ্লিষ্ট কাহারও দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই—বিশেষ করিয়া যেদিন একজন গুরুত্বপূর্ণ রাজসাক্ষীর জেরা চলিতেছিল। ঢাকাতে সম্ভবত ইহাই তাঁহার প্রথম মামলা পরিচালনা। আইনজীবী হিসাবে যেমন তাঁহার সুখ্যাতি রহিয়াছে, ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যও তেমনই তাঁহার সুনাম যথেষ্ট। ট্রাইবুনালের অধিবেশনের সময় কোন বিশেষ বিষয়ের উপর দুই পক্ষের কৌসুলিদের মধ্যে উত্তপ্ত পরিবেশ সৃষ্টি হইবার মুহূর্তে তিনি প্রায়ই সহাস্যবদনে পরিস্থিতির মোকাবেলা করেন। অবশ্য যে-কোন সিনিয়র কৌসুলির নিকট ইহাই প্রত্যাশা করা হয়। শুধু তাহাই নহে, তিনি বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলি হওয়া সত্ত্বেও মাঝে মাঝে বিবাদী পক্ষের প্রধান কৌসুলি সালাম খানকে অপ্রত্যাশিতভাবে কোন কোন ব্যাপারে সাহায্য করিতে আগাইয়া আসিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। জনাব খান বিনীত কণ্ঠে তাহাকে ধন্যবাদ জানান ।

এ সমস্ত কারণেই জনাব মঞ্জুর কাদেরের মাত্র পঁচিশ মিনিটের অনুপস্থিতিও অনুভব করা গিয়াছিল ।

ট্রাইবুনাল কক্ষে

৩০ আগস্ট, ১৯৬৮

পাকিস্তানের দুইজন সাবেক পররাষ্ট্র উজির গতকাল বৃহস্পতিবার বিশেষ ট্রাইবুনাল অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। জনাব মঞ্জুর কাদের রাষ্ট্রের পক্ষের প্রধান কৌসুলি তাঁহার বিপরীতে বিবাদী পক্ষের কৌসুলিদের মধ্যে বসিয়াছিলেন পাকিস্তানের অপর সাবেক পররাষ্ট্র উজির ও বর্তমানে পিপলস পার্টির প্রধান জনাব জেড. এ. ভুট্টো। দর্শক ও কৌসুলিদের মধ্যে তাঁহার উপস্থিতি গতকাল বিশেষ আলোচ্য বিষয় ছিল।

তিনি কি বিবাদী পক্ষের কৌসুলিরূপে কোর্টে যোগদান করিবেন ?

এই প্রশ্নটি গতকাল অনেকের মুখেই স্পষ্ট হইয়া উঠে। সাংবাদিকদের সরাসরি এক প্রশ্নের জবাবে জনাব ভুট্টো সংক্ষেপে বলেন, কাল দেখা যাইবে ।

গত বুধবার তিনি ঢাকা আগমন করেন এবং প্রাথমিক কর্মসূচী অনুযায়ী তিনি এই মাসের ৩১ তারিখ পর্যন্ত ঢাকায় আছেন। ট্রাইবুনালের অধিবেশন শুরু হইবার কয়েক মিনিট পূর্বে জনাব ভুট্টো কক্ষে প্রবেশ করেন। তিনি অভিযুক্তদের কাঠগড়ায় শেখ মুজিবকে দেখিতে পাইয়াই ছুটিয়া যান এবং তাঁহার সাথে করমর্দন করেন। শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর তাঁহারা দুই এক মিনিট কথাও বলেন। জনাব ভুট্টো একটি আসনে ফিরিয়া আসেন। সাংবাদিকের একক প্রশ্ন কোন্ পক্ষের জন্য আপনি আসিয়াছেন ?

জনাব ভুট্টো মৃদু হাসিয়া তাহার বাম দিকের বিবাদী পক্ষের কৌসুলিদের আসন দেখাইয়া দেন।

অধিবেশন শুরু হইবার পূর্বক্ষণে বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব মঞ্জুর কাদের জনাব ভুট্টোকে দেখিতে পান। ইতিমধ্যে জনাব ভুট্টো বিবাদী পক্ষের কৌসুলিদের সাথে আসন লইয়াছেন। জনাব কাদের দ্রুত আসিয়া জনাব ভুট্টোর সাথে করমর্দন করিয়া শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। পার্শ্ব হইতে মন্তব্য শোনা যায়, পাকিস্তানের দুই সাবেক পররাষ্ট্র উজির আজ দুই পক্ষের কৌসুলি?

জনাব জেড. এ. ভুট্টো গতকাল পর্যন্ত শেখ মুজিব বা অন্য কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে ওকালতনামা দস্তখত করেন নাই। আজ হয়ত তিনি ওকালতনামা দস্তখত করিবেন । দর্শকদের গ্যালারীতে পিছনের সারিতে একজন তরুণ এম.

এন. এ-কে দেখা যাইতেছিল। তিনি হইতেছেন সাবেক সিন্ধু প্রদেশের গোলাম মোস্তফা খার। জাতীয় পরিষদে তাঁহার সাম্প্রতিক বক্তৃতার জন্য কনভেনশন মুসলিম লীগ ক্ষুব্ধ হইয়া আছেন । তাঁহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে বলিয়া সংবাদপত্রে জল্পনা-কল্পনা প্রকাশিত হইয়াছিল । তিনি জনাব ভুট্টোর সাথে ঢাকা আগমন করিয়াছেন, জনাব ভুট্টোর সাথেই তিনি ট্রাইবুনালে যান এবং প্রত্যাবর্তন করেন। বিরতির পর মুহূর্তেই জনাব ভুট্টো অভিযুক্তদের কাঠগড়ার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া শেখ মুজিবের সাথে দশ মিনিটকাল গভীরভাবে আলাপ করেন । পরস্পরের কাঁধে হাত রাখিয়া আলাপ করার সময় দুইজনের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছিল কাঠগড়ার আবক্ষ উচ্চ রেলিং।

১৯৫৮ সালের পর হইতে জনাব ভুট্টো দীর্ঘদিন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভাবশালী উজির থাকাকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির ব্যাখ্যা করিতেন এবং কনভেনশন লীগের নীতির মুখর প্রচারক ছিলেন। কেন্দ্রীয় কনভেনশন লীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বও তিনি কিছুদিন পালন করিয়াছিলেন। এই কথা সকলেই জানেন যে, রাজনৈতিক প্রশ্নে শেখ মুজিব ও জেড. এ. ভুট্টো ভিন্নপথের অনুসারী ছিলেন। প্রায় দুই বছর পূর্বে শেখ মুজিব ও ভুট্টো একটি রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে (ছয় দফা) একজন অপরজনের বক্তব্যের বিরোধিতা করিয়া বিবৃতি প্রদান করেন। তখন জনাব ভুট্টো সরকারের নীতি ব্যাখ্যা ও সমর্থন করিয়া বিবৃতি দিতেন। সেই সময় শেখ মুজিব পল্টন ময়দানে জনপ্রিয়তা যাচাইয়ের জন্য জনাব ভুট্টোর প্রতি চ্যালেঞ্জ প্রদান করিয়াছিলেন। জনাব ভুট্টো চ্যালেঞ্জ গ্রহণও করিয়াছিলেন।

বিরতির সময় শেখ মুজিবের সাথে আলাপের পর জনাব ভুট্টো পার্শ্ববর্তী ইমারতে জনাব মঞ্জুর কাদেরের সাথে সাক্ষাৎ করিবার জন্য যান। তাঁহার সাথে ছিলেন এম.এন.এ গোলাম মোস্তফা খার ও প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী (এম.এন.এ)। অধিবেশন পুনরায় আরম্ভ হইবার পরও তাঁহাদের আলাপ চলিতেছিল।

ট্রাইবুনাল কক্ষে

৩১ আগস্ট, ১৯৬৮

সাবেক পররাষ্ট্র উজির জনাব জেড.এ. ভুট্টো গতকাল শুক্রবার বিশেষ ট্রাইবুনাল কক্ষে উপস্থিত ছিলেন না। অনেকেই তাঁহাকে বিবাদী পক্ষে কৌসুলিদের মধ্যে

আশা করিয়াছিলেন ।

রাষ্ট্ বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্যদের মামলায় জনাব ভুট্টো শেখ মুজিবের পক্ষে মামলা পরিচালনা করিতে পারেন বলিয়া প্রচারিত হইয়াছিল। গত বৃহস্পতিবার জনাব ভুট্টো ট্রাইবুনাল অধিবেশনের প্রথমার্ধে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বিরতির সময় কাঠগড়ার নিকট শেখ মুজিবের সাথে প্রায় দশ মিনিট ঘনিষ্ঠভাবে আলোচনাও করেন। কিন্তু তিনি তখন পর্যন্ত ওকালতনামা দস্তখত করেন নাই । গতকাল তিনি হোটেলে কিছুটা অসুস্থ ছিলেন। সম্ভবত সেইজন্যই তিনি ট্রাইবুনাল অধিবেশনে যান নাই ।

তবে তাঁহার বর্তমান ঢাকা সফরকালে কৌসুলি হিসাবে বিশেষ ট্রাইবুনালে উপস্থিত হইবেন কিনা সেই বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। কারণ আজ শনিবার রাত্রে পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী তাঁহার পশ্চিম পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তনের কথা আছে । শনি ও রবিবার বিশেষ ট্রাইবুনালের অধিবেশন মূলতবি থাকিবে। সুতরাং বর্তমান সময়কালে কৌসুলির দায়িত্ব নিতে হইলে তাঁহাকে আগামী সপ্তাহে ঢাকায় থাকিতে হইবে।

ট্রাইবুনাল কক্ষে

৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮

গত কয়েকদিনের ন্যায় গতকাল সোমবার বিশেষ ট্রাইবুনালের অধিবেশন সমাপ্তির পর মুহূর্তে অভিযুক্তদের কাঠগড়ার নিকট ভিড় জমিয়া যায়। ইহাদের মধ্যে অনেকে ছিলেন কৌসুলি —তাঁহারা স্ব-স্ব অভিযুক্ত মক্কেলের সহিত মামলা সংক্রান্ত আলাপের সুযোগ গ্রহণ করেন।

অন্যান্য যাহারা এই ভিড়ের মধ্যে ছিলেন, তাহারা প্রধানত অভিযুক্তদের অনেকের স্ত্রী ও কয়েকজন আত্মীয় ।

কিন্তু তাহাদের ছাড়াও আর যাহারা ঐ ভিড়কে স্ফীত করিয়াছিলেন তাহারা হইতেছেন—সাদা পোশাকে ডিউটিরত সরকারী কর্মচারীগণ—স্বাভাবিকভাবেই দর্শকদের গ্যালারীর সম্মুখে ও অভিযুক্তদের কাঠগড়ার নিকটে কিছুসংখ্যক পুলিশ পাহারারত ছিলেন ।

প্রথম ব্যক্তি (সাদা পোশাক পরিহিত) : আপনি কি এডভোকেট ?

দ্বিতীয় ব্যক্তি (তরুণ এডভোকেট) : হ্যাঁ, এডভোকেট।

প্রথম ব্যক্তি : আপনি কি কারো নামে ওকালতনামায় দস্তখত করিয়াছেন ?

দ্বিতীয় ব্যক্তি : আপনি কে ? কেন এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন? হ্যাঁ, দস্তখত করিয়াছি ।

প্রথম ব্যক্তি : না, আপনি ওকালতনামা দেন নাই ।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : কি অধিকারে আপনি এই প্রশ্ন করিতেছেন ?

(প্রথম ব্যক্তি পরিচয় দিতে নারাজ। ইতিমধ্যে কোর্ট কক্ষে কথা কাটাকাটি শুরু হয় । জনৈক সিনিয়র কৌসুলি এডভোকেটদের ওকালতনামা ও পরিচয় সম্পর্কে যে কোন সময় যে কোন ব্যক্তির জিজ্ঞাসাবাদের প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, ইহা অত্যন্ত গর্হিত ও দুঃখজনক। অনেক ক্ষেত্রে পরিচয় জানার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ সীমা ছাড়াইয়া যাইতেছেন। ইহাদের কোন অধিকার নাই কক্ষের মধ্যে কাহারো উপস্থিতির অধিকার চ্যালেঞ্জ করা । কক্ষে প্রবেশের সময়ই প্রত্যেকের কার্ড দেখা হয়। সংশ্লিষ্ট অফিসার তাহার দায়িত্ব পালন করেন ।

এই উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তে জনৈক পদস্থ অফিসার (গোয়েন্দা বিভাগের) আগাইয়া আসেন এবং পরিবেশ শান্ত করার চেষ্টা করেন ।

গতকাল অধিবেশন কক্ষে বেশ কয়েকদিন পর দর্শক ও এডভোকেটদের গ্যালারীতে উল্লেখযোগ্য ভিড় পরিলক্ষিত হয়।

বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব মঞ্জুর কাদের অন্যবিধ কাজে ব্যস্ত থাকায় গতকাল অধিকাংশ সময় অধিবেশন কক্ষে উপস্থিত ছিলেন না ।

ট্রাইবুনাল কক্ষে

৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮

এখনও তাঁহাকে দর্শকের গ্যালারীতে মাঝে মাঝে দেখা যায়—মহিলাদের সারিতে তিনি বসিয়া থাকেন ।

জনাব কামালউদ্দিন এখন মুক্ত। সাক্ষ্যদানও তাঁহার সমাপ্ত হইয়াছে। আটক

অবস্থায় তিনি বাদীপক্ষের সাক্ষীরূপে বিশেষ ট্রাইবুনালে উপস্থিত হন, বৈরী সাক্ষী হিসাবে তিনি তাঁহার সাক্ষ্য শেষ করেন। সেই কামালউদ্দিনের স্ত্রী হাসিনা কামালকে এখনও দর্শকদের গ্যালারীতে দেখা যায় ।

কামালউদ্দিন মুক্তি পাইয়াছেন ট্রাইবুনালের নির্দেশে—তবুও বেগম কামালউদ্দিন প্রায়ই আসেন। কেন ?

তিনি ট্রাইবুনালের অধিবেশন সমাপ্তির জন্য অপেক্ষা করেন। অধিবেশন সমাপ্ত হইলে অন্যান্য মহিলা দর্শকের সাথে তিনিও অভিযুক্তদের কাঠগড়ার দিকে আগাইয়া যান। কাঠগড়ার রেলিংয়ের পাশে চারি নম্বর অভিযুক্ত ব্যক্তি (লিডিং সীম্যান) সুলতানউদ্দিন তাহার জন্য অপেক্ষা করেন। সুলতানউদ্দিন মিসেস কামালের ভাই।

মিসেস হাসিনার স্বামী মুক্ত। অবশ্য তিনি অভিযুক্ত ছিলেন না। কিন্তু ভাই সুলতানউদ্দিন কাঠগড়ায় অভিযুক্তদের সারিতে।

সেইজন্য মিসেস কামালকে প্রায়ই আসিতে হয় ভাইয়ের কুশলবার্তা জানিবার জন্য । স্বামী মুক্তি পাইলেও তাঁহার আসা বন্ধ হয় নাই ।

ট্রাইবুনাল কক্ষে

৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮

বিশেষ ট্রাইবুনালে দর্শকের সংখ্যা মাঝে মাঝে বৃদ্ধি পাইলেও প্রকৃতপক্ষে ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিতেছে। দর্শকদের গ্যালারীতে এখন প্রায়ই অনেক আসন শূন্য পড়িয়া থাকে । এডভোকেটদের পিছনের সারির আসনগুলি বেশ কিছুদিন যাবৎই শূন্য থাকিতেছে। কিন্তু দুইপক্ষের সাথে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট প্রায় পনেরজন কৌসুলি, ডজনখানেক সাংবাদিক ও কয়েকজন অভিযুক্ত ব্যক্তির স্ত্রী গত মাসাধিককাল যাবৎ বিশেষ ট্রাইবুনাল কক্ষে নিয়মিত উপস্থিত থাকেন। তাহাদের সকলেরই আসন যেন নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে । প্রত্যেকেই তাহারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট স্থানে যাইয়া বসেন। উল্লিখিত কৌসুলি, মহিলা দর্শক ও সাংবাদিক ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর লোকদের ভিড় কমিয়া যাইবার উল্লেখযোগ্য কারণ যে নাই, তাহা নহে । প্রত্যহ ভোরে উঠিয়া শহর হইতে পাঁচ মাইল দূরে সেনানিবাসে সময়মত উপস্থিত হওয়া সকলের জন্য সম্ভব হইয়া উঠে না।

যে সমস্ত এডভোকেট হাইকোর্টে বা জেলা কোর্টে নিয়মিত ব্যবসায় করিতেন এবং রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান গং মামলা পরিচালনার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত নহেন, তাহারা অনেকেই এখন বিশেষ ট্রাইবুনালে যাওয়া বন্ধ করিতেছেন। যাঁহারা উক্ত মামলায় ওকালতনামা দাখিল করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকেরই অন্যান্য কোর্টে মামলা থাকে বলিয়া মাঝে মাঝে অনুপস্থিত থাকিতে হয়। অবশ্য বিবাদী পক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব সালাম খানসহ কয়েকজনকে কোনদিনই অনুপস্থিত দেখা যায় নাই। তবে ট্রাইবুনালের কাজের পর কোন কোন দিন জনাব সালাম খানও মাঝে মধ্যে হাইকোর্টে গিয়াছিলেন।

এমন অনেক দর্শক আছেন, (অনেক ক্ষেত্রে অভিযুক্তদের আত্মীয়) যাঁহারা প্রত্যহ ট্রাইবুনালে যাইতে চাহিয়াও অন্যত্র চাকরি করেন বলিয়া যান না।

তাহা ছাড়া এক মাসের অধিক সময় ট্রাইবুনালের কাজ একনাগাড়ে চলিবার ফলে, সংশ্লিষ্ট কৌসুলিগণও যেন পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। অবশ্য বিচারপতি রহমান কয়েকদিন পূর্বে ট্রাইবুনালের অধিবেশন এক মাসের মত স্থগিত থাকিবে বলিবার পর পরিশ্রান্ত কৌসুলিগণ সুখী হইয়াছেন।

ট্রাইবুনাল কক্ষে

৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮

শেখ মুজিবুর রহমানের একজন বিশেষ ভক্ত গতকাল বৃহস্পতিবার ট্রাইবুনাল কক্ষে দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। অধিবেশনের বিরতির সময় দর্শকদের ভিড় ঠেলিয়া পুলিশের কাতারের পাশে আসিয়া 'মুজিব ভাই ! আমি এখানে!" এই বলিয়া চিৎকার করিয়া যিনি ডাকিতেছিলেন তিনি চাঁদপুরের আবদুল মতিন পাটোয়ারি ।

পঙ্গু আবদুল মতিন হামাগুড়ি দিয়া চলাফেরা করেন—দুই হাঁটু ও দুই হাতের ওপর ভর করিয়া তাহাকে চলিতে হয়। নদী-বন্দর চাঁদপুর হইতে তিনি ঢাকায় আসিয়াছেন ষড়যন্ত্রের সহিত জড়িত বলিয়া কথিত অভিযুক্তদের কাঠগড়ায় শেখ মুজিবকে একনজর দেখিবার জন্য। ট্রাইবুনালে আসিবার জন্য তিনি কার্ড সংগ্রহ করিয়াছেন— সেনানিবাস এলাকায় সঠিক সময়ে পৌঁছিবার জন্য কোন প্রকার কসুর করেন নাই । যে কোনভাবে হউক তিনি তাহার রাজনৈতিক নেতা শেখ মুজিবকে দেখিবেন। দর্শকদের অনেকেই বিরতির সুযোগে চা কাউন্টারের দিকে ছুটিতে ছিলেন, কাঠগড়ায় অভিযুক্তদের

অনেকে কৌসুলিদের সাথে কথা বলিতে ব্যস্ত, সেই সময় দর্শক গ্যালারীর সম্মুখে সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান প্রহরারত পুলিশদের পাশ হইতে আবদুল মতিন পাটোয়ারির কণ্ঠস্বর শোনা গেল : 'মুজিব ভাই, ভালো আছেন?' শেখ মুজিব সেই মুহূর্তে কাঠগড়ার পিছনের দিকে রেলিংয়ের ধারে কাহারো সহিত কথা বলিতেছিলেন। দর্শকদের ভিড়ের মধ্যে পুলিশের বাধার সম্মুখে উক্ত পাটোয়ারি সাহেবকে দেখিতে পাইয়া শেখ মুজিব অবাক হইয়া বলেন, 'আরে তুমি! কি কাণ্ড! '

শেখ মুজিব তাঁহার নিকটে যাইবার জন্য উক্ত পাটোয়ারিকে ছাড়িয়া দিতে পুলিশকে বলেন। পাটোয়ারি সাহেবের মুখমণ্ডল তখন পরম আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে। তিনি হামাগুড়ি দিয়া ধীরে ধীরে বিস্মিত দর্শকদের দৃষ্টির সম্মুখে শেখ মুজিবের কাছে আগাইয়া যান ।

ট্রাইবুনাল কক্ষে

১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮

বিশেষ ট্রাইবুনালের অধিবেশন সমাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের গ্যালারীর সম্মুখে গতকাল সোমবার পুনরায় প্রহরারত পুলিশ আসিয়া দাঁড়ান—অভিযুক্তদের কাঠগড়ার দিকে মহিলা দর্শকদেরও যাওয়া নিষিদ্ধ।

গতকাল কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির স্ত্রী বা আত্মীয়া স্ব- স্ব অভিযুক্ত আত্মীয়দের সহিত অধিবেশন শেষ হইবার পর সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই ।

প্রায় দশ-বারোদিন পূর্বে বিবাদী পক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব সালাম খানের অনুরোধক্রমে ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি এস. এ. রহমান অধিবেশন সমাপ্তির পর অভিযুক্তদের স্ত্রী বা আত্মীয়াদের কাঠগড়ার নিকট স্ব-স্ব আত্মীয়দের সহিত স্বল্পকালীন সাক্ষাতের অনুমতি দিয়াছিলেন। সেই অনুমতি দানের পর গত কিছুদিন যাবৎ প্রধানত কয়েকজন তরুণ অভিযুক্ত ব্যক্তির স্ত্রী, দুই চারিজন আত্মীয়া অধিবেশন শেষ হইবার পর অভিযুক্তদের কাঠগড়ার নিকট পুলিশের তত্ত্বাবধানে দেখা করার নিয়মিত সুযোগ পাইয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু গতকাল অকস্মাৎ সেই সুযোগের ব্যাঘাত ঘটে। উক্ত স্থানে প্রহরারত পুলিশদের প্রধান মহিলা দর্শকদের সুস্পষ্টভাবে জানান যে, অভিযুক্তদের সহিত তাহাদের সাক্ষাতের অনুমতি নাই। এই নয়া ব্যবস্থার কথা শুনিয়া সাক্ষাতেচ্ছুক মহিলা দর্শকগণ স্তম্ভিত হইয়া যান । তাঁহারা বিস্মিত হইয়া

পুলিশ অফিসারকে কোর্টের নির্দেশ স্মরণ করাইয়া বলেন যে, গত কিছুদিন যাবৎ তাঁহারা কোর্টের নির্দেশানুযায়ী অভিযুক্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেছেন।

শেষ পর্যন্ত গতকাল অভিযুক্তদের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ করা সম্ভব হয় নাই। তাহারা স্ব-স্ব আত্মীয়দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অসমর্থ হইয়া ভগ্ন হৃদয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে অধিবেশন কক্ষ ত্যাগ করেন।

অধিবেশন সমাপ্তির পর অভিযুক্তদের সঙ্গে আত্মীয়াদের (প্রধানত তাঁহাদের স্ত্রী) সাক্ষাতের অনুমতি মাত্র একদিনের জন্য ছিল বলিয়া জনৈক সংশ্লিষ্ট অফিসার জানান।

ট্রাইবুনাল কক্ষে

১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮

রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্যদের মামলায় অভিযুক্তদের স্ত্রীদের পক্ষে স্ব-স্ব স্বামীর সাথে গতকাল ট্রাইবুনাল কক্ষে সাক্ষাৎ করা সম্ভব হয় নাই। প্রায় দুই সপ্তাহ পূর্বে অধিবেশন শেষে সাক্ষাতের অনুমতি লাভের পর গত সোমবার হইতে তাহারা সাক্ষাৎ করিতে পারিতেছেন না । অধিবেশন শেষে প্রত্যহ অল্পক্ষণের জন্য স্ব-স্ব স্বামীর সাথে সাক্ষাতের আবেদন ট্রাইবুনাল মঞ্জুর করেন নাই ।

গতকাল অধিবেশন শেষে বিবাদী পক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব সালাম খান সাক্ষাতের মৌখিক অনুমতি চাহিয়া বলেন যে, ইতিপূর্বে তরুণী স্ত্রীদের কিছুক্ষণের জন্য সাক্ষাতের অনুমতি প্রদান করা হইয়াছিল। ইহার ফলে তাহারা উপকৃত হইয়াছেন। কিন্তু এখন পুনরায় অভিযুক্তদের সাথে তাঁহাদের স্ত্রীগণ অধিবেশন শেষে ট্রাইবুনাল কক্ষে সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হন না। পুনরায় সাক্ষাতের অনুমতি দিলে তাঁহারা উপকৃত হইবেন।

বিচারপতি জনাব এস. এ. রহমান কোর্ট কক্ষ ত্যাগের পূর্বে উক্ত আবেদনের উত্তরে বলেন যে, ‘প্রত্যেক দিন নহে। রেজিস্ট্রারকে পূর্বের ন্যায় ব্যবস্থা করিতে বলা আছে।'

বিচারপতিদের কক্ষ ত্যাগের পর বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব মঞ্জুর কাদের মামলা সংক্রান্ত কোন বিষয়ে জনাব সালাম খানের সাথে ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা করিতেছিলেন। সেই সময় পাশেই অভিযুক্তদের কাঠগড়ার

রেলিংয়ের ধারে তিনি অভিযুক্ত লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেমকে দেখিতে পাইয়া সহাস্যবদনে বলেন, কেমন আছেন। কোন অসুবিধা হয় না তো । লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম প্রতিশুভেচ্ছা জানাইয়া বলেন, মহিলা দর্শকদের সাক্ষাতের বিষয়টির প্রতি আপনিও লক্ষ্য রাখিতে পারেন।

মঞ্জুর কাদের : এই ব্যাপারে বিচারপতি উত্তর দিয়াছেন। তবে আশা করা যায় আগামীতে সম্ভব হইবে ।

অধিবেশন শেষ হইবার প্রায় দশ মিনিট পরও অভিযুক্তদের কয়েকজনের স্ত্রী ট্রাইবুনাল কক্ষে উপস্থিত ছিলেন। জনৈকা মহিলা বলেন যে, হয়ত রেজিস্ট্রার শেষ পর্যন্ত আমাদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিতে পারেন, সেই আশায় আছি।

তাহারা পরে ফিরিয়া আসিয়াছেন—সাক্ষাতের কোন ব্যবস্থা হয় নাই ।

ট্রাইবুনাল কক্ষে

১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮

অভিযুক্তদের স্ত্রীগণ বিশেষ ট্রাইবুনালের অধিবেশন শেষ হইবার পর গতকাল বৃহস্পতিবার স্ব-স্ব স্বামীর সাথে কাঠগড়ার নিকট সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হন। অধিবেশন শেষ হইবার পরই ট্রাইবুনালের রেজিস্ট্রার জনাব মীর্জা অভিযুক্তদের স্ত্রীদের (অবশ্য যাঁহারা দর্শকরূপে গ্যালারীতে উপস্থিত ছিলেন) কাঠগড়ার নিকট আসিয়া আলাপ করার ব্যবস্থা করেন। প্রকাশ, আজও অনুরূপ সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হইবে। দুইদিন পূর্বে এই রূপ সাক্ষাতের জন্য বিচারপতি রহমানের নিকট দ্বিতীয়বার অনুরোধ জানান হইয়াছিল। জনাব সালাম খানের উক্ত অনুরোধের প্রেক্ষিতে এই সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হয়। ভবিষ্যতে এই রূপ সাক্ষাতের কি ব্যবস্থা করা হইবে তাহা জানা যায় নাই। বিরতির সময় দুই নম্বর অভিযুক্ত ব্যক্তি লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব মঞ্জুর কাদেরের সাথে কাঠগড়ার নিকট আলোচনা করেন । প্রকাশ, তিনি জনাব কাদেরকে জানান যে, অভিযুক্তদের মধ্যে নেভির তিন ব্যক্তি ছাড়া অন্য দুইজন সামরিক বাহিনীর অফিসারদের পুরো বেতন দেওয়া হয় । পি.আই.এ ও বিমান বাহিনীর আইন অনুযায়ী নাকি এই বেতন দেওয়া হয়। সি.এস.পি (তিনজন) অফিসারদের এক-তৃতীয়াংশ বেতন দেওয়া হয়। তাঁহাদের খাদ্যের চার্জ দিতে হয় না । নেভির অফিসারদের অধিক বেতন দেওয়া হইতেছে এবং উক্ত টাকা হইতে মাসে খাদ্য বাবদ কাটা হইয়া

থাকে। নেভির অফিসারদের পূর্ণ বেতন বা খাদ্যের টাকা না কাটার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। তাঁহাকে আরও জানান হয় যে, অভিযুক্তগণ বেতন বাবদ যে টাকা পাইতেছেন, তাহাতে তাহাদের সংসার চালান এবং সন্তানদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা কষ্টকর ।

জনাব কাদের সমস্ত কথা সহানুভূতির সাথে শ্রবণ করেন এবং তিনি এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানাইবেন বলিয়া আশ্বাস দেন।

ট্রাইবুনাল কক্ষে

১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮

বিস্মিত কোর্টের সম্মুখে অভিযুক্ত ক্যাপ্টেন খুরশীদউদ্দিন আহমদ গতকাল অধিবেশন চলিবার সময় অপ্রত্যাশিতভাবে অভিযুক্তদের কাঠগড়ার আবক্ষ উচ্চ রেলিং টপকাইয়া এজলাসের নিকট উপস্থিত হন। তরুণ ক্যাপ্টেন হাস্যরোলের মধ্যে নির্বিঘ্নে রেলিংয়ের বাধা অতিক্রম করেন। ইহা তাঁহার অপরাধের মধ্যে গণ্য হয় নাই। বিচারপতিগণ এই অভূতপূর্ব দৃশ্য উপভোগ করেন এবং এমনকি চেয়ারম্যান বিচারপতি রহমানকে হাসির মধ্যে একটি সুন্দর মন্তব্য করিতেও শোনা যায় ।

বিশেষ ট্রাইবুনালের মামলার সাথে সংশ্লিষ্ট বলিয়া কথিত একটি পত্রের ব্যাপারে তাহার নমুনা হস্তলিপি প্রদানের প্রশ্ন উঠে। বিচারপতি রহমান তাহাকে হস্তলিপি প্রদানের অনুমতি দেন।

কিন্তু অভিযুক্তদের কাঠগড়ার অভ্যন্তর হইতে ক্যাপ্টেন খুরশীদ কিভাবে এজলাসের নিকট আসিবেন, সেই কথা সেই মুহূর্তে কেউ-ই ভাবেন নাই। কাঠগড়া হইতে কক্ষে বাহির হওয়ার সরাসরি কোন পথ বা দরজা নাই। তাঁহাকে কাঠগড়া সংলগ্ন অভিযুক্তদের বিশ্রাম কক্ষের মধ্য দিয়া ঘুরিয়া কাহারও তদারকে এজলাসের নিকট পৌছাতে হইত। তরুণ ক্যাপ্টেন অতটা ঝামেলার জন্য অপেক্ষা করেন নাই –তিনি বিনা দ্বিধায় রেলিংয়ের উপর উঠিয়া পড়েন এবং সকলের অবাক দৃষ্টির সম্মুখে রেলিং অতিক্রম করেন ।

অবশ্য তিনি পুনরায় রেলিং অতিক্রম করিয়া অভিযুক্তদের কাঠগড়ায় প্রত্যাবর্তন করেন নাই। কোর্টের সম্মুখে নমুনা হস্তলিপি প্রদানের পর তাঁহাকে কক্ষের মধ্য দিয়া অন্যপথে কাঠগড়ায় ফিরিয়া যাইতে হয় ।

অধিবেশন শেষ হইবার পর বেগম মুজিব শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে কাঠগড়ার নিকট সাক্ষাৎ করেন। তরুণ কামালও গতকাল অভিযুক্ত পিতা শেখ মুজিবের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পান। বেগম মুজিব ট্রাইবুনাল কক্ষে মাঝে মাঝে যান । কিন্তু পুত্র কামাল দূর হইতে পিতাকে দেখিবার জন্য প্রায় প্রত্যহই কক্ষে উপস্থিত থাকেন। তবে তাহার পক্ষে পিতার সহিত সাক্ষাৎ করা অধিকাংশ সময়ই সম্ভব হইত না । গতকাল রেজিস্ট্রার তাহাকেও পিতার সাথে সাক্ষাতের জন্য কাঠগড়ার নিকট যাইতে অনুমতি দেন।

অন্য অভিযুক্তদের স্ত্রী ও আত্মীয়গণও গতকাল স্ব-স্ব স্বামী বা আত্মীয়ের সাথে অধিবেশন মুলতবি শেষে সাক্ষাতের সুযোগ পান ।

ট্রাইবুনাল কক্ষে

১৫ অক্টোবর, ১৯৬৮

বিরতির পূর্ব পর্যন্ত বিশেষ ট্রাইবুনাল কক্ষে কৌসুলি ও দর্শকদের মধ্যে প্রায়ই উৎসাহ ও ব্যস্ততা পরিলক্ষিত হইত। কিন্তু শুনানি পুনরারম্ভের প্রথমদিন গতকাল সোমবার ব্যতিক্রম দেখা গিয়াছে ।

দর্শকদের গ্যালারীতে অভিযুক্তদের আত্মীয়-দর্শকদের বাদ দিলে দর্শকদের সংখ্যা ছিল নগণ্য এবং কৌসুলিদের গ্যালারীতে আসনের অভাব হয় নাই। অবশ্য কিছুসংখ্যক বিক্ষিপ্ত আসনে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক চেনা-অচেনা সরকারী অফিসারদের পূর্বের ন্যায়ই দেখা যায়। যে সমস্ত রাজসাক্ষীর বক্তব্যের উপর প্রধানত মামলার গুরুত্ব নির্ভর করে, তাহাদের সাক্ষ্য দান শেষ হইয়া যাওয়াতে অনেকের আগ্রহ ও উৎসাহ অনেকটা প্রশমিত হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া জনৈক বিশিষ্ট কৌসুলি মন্তব্য করেন।

শেখ মুজিবুর রহমানের স্ত্রী গতকাল ট্রাইবুনাল কক্ষে উপস্থিত ছিলেন। অভিযুক্ত তিনজন সি.এস.পি অফিসার ও কয়েকজন সামরিক অফিসারের স্ত্রীকেও ট্রাইবুনাল কক্ষে দর্শকদের গ্যালারীতে দেখা যায়। পূর্ব অনুমতি মোতাবেক অভিযুক্তদের স্ত্রীগণ স্ব-স্ব স্বামীর সাথে অধিবেশন সমাপ্তির পর কাঠগড়ার নিকট সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন । পুলিশের তত্ত্বাবধানে এই সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হয় ।

অধিবেশন শুরু হইবার পাঁচ মিনিট পূর্বে অভিযুক্তদের কাঠগড়ায় আনা হয় ।

শেখ মুজিব সবার প্রথমে কাঠগড়ায় আসার পরই কক্ষে উপস্থিত কৌসুলিগণ তাঁহাকে শুভেচ্ছা জানান । কয়েকজন কৌসুলি তাঁহার নিকট যাইয়া করমর্দন করিয়া মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে স্বল্প সময়ের জন্য আলাপ করেন। অভিযুক্তদের সাথে বাহিরের কেহ বিনা অনুমতিতে সাক্ষাৎ করিতে বা কথা বলিতে স্বাভাবিকভাবেই পারেন না; কিন্তু গতকাল বিরতির সময় জনৈক ব্যক্তিকে (যাহাকে পূর্বে দেখা যায় নাই) একজন অভিযুক্ত ব্যক্তির সাথে দশ মিনিটকাল কথা বলিতে দেখা যায় ।

ট্রাইবুনাল কক্ষে

১৬ অক্টোবর, ১৯৬৮

'ষড়যন্ত্র মামলায়' অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পত্নীগণ এখন হইতে বিশেষ ট্রাইবুনালের অধিবেশন শেষ হইবার পর স্ব-স্ব স্বামীর সাথে কাঠগড়ার নিকট কিছুক্ষণের জন্য সাক্ষাৎ করিতে সক্ষম হইবেন। কিন্তু সপ্তাহে মাত্র একবার এই সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং এইরূপ সাক্ষাৎ প্রতি সোমবার হইবে।

কিছুদিন পূর্বে বিবাদী পক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব সালাম খান অভিযুক্তদের পত্নীদের সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। উক্ত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি জনাব রহমান সম্প্রতি অধিবেশন শেষে অনুরূপ সাক্ষাতের ব্যবস্থা অনুমতি দিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

হয়তো আগামীতে এইরূপ সাক্ষাতের ব্যবস্থা সোমবারের বিবর্তে প্রতি শুক্রবার করা হইতে পারে। সপ্তাহে দুইবার এইরূপ সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিলে উপকৃত হইবেন বলিয়া কয়েকজন অভিযুক্ত ব্যক্তির স্ত্রী মনে করেন। ইতিমধ্যে কেহ কেহ সোমবারের পরিবর্তে শুক্রবার এই সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিবার জন্য ট্রাইবুনালের রেজিস্ট্রারকে অনুরোধ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর গতকাল মঙ্গলবার হইতে কয়েকজন মহিলা দর্শক ট্রাইবুনাল অধিবেশনে আসিতেছেন না। তাঁহারা হয়ত প্রতি সোমবার স্ব-স্ব স্বামীর সাথে সাক্ষাতের আশায় অধিবেশনে আগমন সুবিধাজনক মনে করেন ।

কিন্তু অধিবেশন আরম্ভ হইবার প্রথম দিন হইতেই কয়েকজন অভিযুক্ত ব্যক্তির স্ত্রীকে প্রতিদিনই দর্শকদের গ্যালারীতে বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। তাঁহারা নিয়মিত প্রতিদিন সকালে কক্ষে প্রবেশ করেন এবং অধিবেশন শেষ হইলে অন্যদের সাথে নীরবে চলিয়া যান । প্রতিদিন অধিবেশনে উপস্থিত থাকা যেন

তাঁহারা দৈনন্দিন কাজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

ট্রাইবুনাল কক্ষে

৭ অক্টোবর, ১৯৬৮

মহিলাদের গ্যালারীতে আলাপের গুঞ্জরন সম্পর্কে এই প্রথম বিচারপতি রহমান মন্তব্য করেন। বিশেষ ট্রাইবুনালের অধিবেশন চলিবার সময় এক পর্যায়ে তিনি বলেন যে, মহিলাদের গ্যালারীতে আলাপ-আলোচনা চলিতেছে ।

গতকাল অধিবেশন কক্ষে প্রায়ই আলাপের গুঞ্জরন শোনা গিয়াছে। বিচারপতি রহমান অন্তত আটবার সবাইকে আলাপ না করার জন্য এবং গুঞ্জরন বন্ধ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। কক্ষে অধিবেশনের সময় আলাপ চলিতে থাকিলে মামলার কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় বলিয়াও তিনি বলেন। তিনি অভিযুক্তদের কাঠগড়াতেও জোরে কথাবার্তা হয় বলিয়াও মন্তব্য করেন।

এক সময় বিচারপতি এম.আর. খান এই অবিরাম আলাপ সম্পর্কে কৌসুলিদের লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, ইহাতে বিবরণীর রেকর্ড রাখিতে অসুবিধা হইয়া থাকে।

গতকাল প্রথমবার অভিযুক্তদের ঠিক নয়টার সময় অধিবেশন কক্ষে কাঠগড়ায় আনা হয়। ইতিপূর্বে প্রত্যহ বিচারপতিগণ এজলাসে আগমনের পাঁচ মিনিট পূর্বে তাঁহাদের কক্ষে আনা হইত। গতকাল একই সময়ে বিচারপতিগণ ও সকল অভিযুক্ত ব্যক্তি কক্ষে প্রবেশ করেন।

অধিবেশন শেষ হইবার সময় কৌসুলি কে.জেড. আলম কোর্টের নিকট আবেদন করিয়া বলেন যে, অভিযুক্তদের অধিবেশন আরম্ভ হইবার দশ মিনিট পূর্বে কক্ষে আনার ব্যবস্থা করিলে কৌসুলিগণ তাঁহাদের সাথে মামলা সম্পর্কে আলাপ করিতে পারেন।

বিচারপতি রহমান এই প্রস্তাবে সম্মত হন নাই ।

ট্রাইবুনাল কক্ষে

১৮ অক্টোবর, ১৯৬৮

অভিযুক্তদের গতকাল বৃহস্পতিবার অধিবেশন শুরু হইবার প্রায় দশ মিনিট

পূর্বে ট্রাইবুনাল কক্ষে আনয়ন করা হয় । কেবলমাত্র গত বুধবার ব্যতীত ইতিপূর্বে অন্যান্য দিনে ও অধিবেশনের কয়েক মিনিট পূর্বে অভিযুক্তদের কক্ষে আনা হইত। জনৈক কৌসুলি গত বুধবার কোর্টের নিকট আবেদন করেন যে, কয়েক মিনিট পূর্বে অভিযুক্তদের কক্ষে আনা হইলে কৌসুলিগণ মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে আলাপের সুযোগ পাইবেন ।

গতকাল অধিবেশন কক্ষে আলাপের গুঞ্জরন কোন কোন সময় শোনা গিয়াছে। কিন্তু অন্যান্য দিনের ন্যায় বিরক্তিকর ছিল না। তবুও গতকাল বিচারপতি রহমানকে দুইবার আলাপ বন্ধ করার জন্য মন্তব্য করিতে হয়।

গত দুইদিন যাবৎ বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব মঞ্জুর কাদের অধিবেশনের সময় কক্ষে অধিকাংশ সময় থাকিতে পারিতেছেন না । প্রকাশ, মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারেই তিনি অন্যান্য কাজে ব্যস্ততার মধ্যে সময় কাটাইতেছেন। তাঁহার স্থলে গতকালও জনাব টি এইচ খান রাজসাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করেন। তবে বিরতির সময় তিনি একবার ব্যস্ততার সাথে কক্ষে আসেন এবং জনৈক অভিযুক্ত ব্যক্তির সাথে আলাপ করেন।

ট্রাইবুনাল কক্ষে

১৯ অক্টোবর, ১৯৬৮

বিশেষ ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি এস এ রহমান গতকাল তিনটি বাংলা শব্দ উচ্চারণ করেন—জোরে, আসেন ও বলেন। এই প্রথম মাননীয় বিচারপতিকে প্রথম বাংলা শব্দ উচ্চারণ করিতে শোনা যায়। দশম রাজসাক্ষী ইউসুফ জবানবন্দী দানের সময় মৃদুকণ্ঠে জবাব দান করিতেছিলেন। সেই সময় বিচারপতি রহমান বলেন, ‘জোরে জোরে।'

রাজসাক্ষী একবার অভিযুক্ত কাঠগড়ার নিকট জনৈক অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সনাক্ত করিয়া একটু বিলম্বে নিজের স্থানে ফিরিতেছিলেন। বিচারপতি সহাস্যবদনে বলেন : ‘আসেন আসেন।'

জনৈক অভিযুক্ত ব্যক্তি (বৈরী সাক্ষীর জেরার পর) কাঠগড়ার মধ্যে কোন কারণে দাঁড়াইয়াছিলেন। বিচারপতি রহমান পুনরায় বাংলায় বলেন, ‘বসেন।

ট্রাইবুনাল কক্ষে

২২ অক্টোবর, ১৯৬৮

বিশেষ ট্রাইবুনালের দীর্ঘদিন অধিবেশনের মধ্যে গতকাল সোমবারই প্রথম বিবাদী পক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব সালাম খান উপস্থিত ছিলেন না। তিনি অবশ্য গত শুক্রবারই ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যানকে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি হয়ত অনুপস্থিত থাকিবেন। সেইজন্য তাঁহার পরামর্শ অনুযায়ী এডভোকেট জনাব জহিরুদ্দিন শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন। জনাব সালাম খানের অনুপস্থিতি, অধিবেশন সংক্ষিপ্ত হইলেও সকলেই অনুভব করিতে পারিয়াছেন ।

বিবাদী পক্ষের জনৈক কৌসুলি গতকাল একাদশ রাজসাক্ষী সার্জেন্ট হালিমকে জেরা করার সময় একটি প্রশ্ন করিতে যাইয়া কিছুটা ইতস্তত করিতেছিলেন। বিচারপতি রহমান তাঁহাকে জানান যে, উক্ত এনটি ইতিমধ্যে অপর একজন কৌসুলি করিয়াছেন ।

সেই মুহূর্তে কৌসুলি ক্ষণকালের জন্য অন্যমনস্ক হইয়া পড়েন এবং হঠাৎ রাজসাক্ষীকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠেন—'হ্যালো!' বিব্রত কৌসুলির সহকর্মীগণ সকলে হাসি চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই ।

গতকাল সোমবার ছিল—সেইজন্য পূর্বের নির্ধারিত ব্যবস্থা অনুযায়ী অভিযুক্তদের উপস্থিত পত্নীগণ অধিবেশন সমাপ্তির পর স্ব-স্ব স্বামীর সাথে কাঠগড়ার নিকট সাক্ষাৎ করিতে পারিয়াছেন। তবে গতকাল অধিবেশন সংক্ষিপ্ত হওয়ার কথা ছিল বলিয়া মহিলা দর্শকদের ভিড় কম ছিল।

গতকাল প্রথম শেখ মুজিব কাঠগড়ায় উপস্থিত না থাকায় যে সমস্ত দর্শক দূর হইতে তাঁহাকে দেখিতে অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা স্বাভাবিকভাবেই নিরাশ হইয়াছেন । এই প্রথম শেখ মুজিব ট্রাইবুনালে উপস্থিত ছিলেন না— তাঁহাকে গোপালগঞ্জে অসুস্থ মাতাকে দেখিবার জন্য লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।

ট্রাইবুনাল আমার কক্ষে

২৩ অক্টোবর, ১৯৬৮

বিশেষ ট্রাইবুনালের অধিবেশন শুরু হইবার প্রায় দশ মিনিট পূর্বে অভিযুক্তদের ট্রাইবুনাল কক্ষের কাঠগড়ায় আনার সময় সর্বাগ্রে ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। উপস্থিত দর্শক ও কৌসুলিদের দৃষ্টি তাঁহারই উপর নিবদ্ধ হইয়াছিল।

কয়েকজন কৌসুলি কাঠগড়ার নিকট যান এবং শেখ মুজিবের সাথে করমর্দন করিয়া তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করেন। সম্ভবত গত সোমবার কোর্টে তাঁহার অনুপস্থিতি তাঁহার সম্পর্কে উৎসাহ বৃদ্ধি করিয়াছিল। সকলেই গতকালকার কাগজে দেখিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার অসুস্থ মাতাকে দেখিবার জন্য গোপালগঞ্জে গমন করিয়াছেন ।

তদুপরি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ (ছয় দফাপন্থী) গত শনিবার কাউন্সিল অধিবেশনে পুনরায় তাঁহাকে সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্বাচিত করায় দর্শকগণ তাঁহাকে দেখিতে আরও উৎসাহী ছিলেন।

গতকালই প্রথম দুইজন সাক্ষী একই দিনে ট্রাইবুনালে সাক্ষ্যদানের জন্য উপস্থিত হন । ইতিপূর্বে অবশ্য একদিনে দুইজন উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা ছিলেন রাজসাক্ষী ।

এডভোকেট জনাব জহিরুদ্দিন আহমদ গতকাল প্রথম সাক্ষীকে জেরা করেন। ইতিপূর্বে তিনি প্রায় প্রত্যহ ট্রাইবুনালে উপস্থিত থাকিতেন এবং জনাব সালাম ও অন্য কৌসুলিদের সাহায্য করিতেন। জনাব সালাম খানের অনুপস্থিতিতে জনাব জহিরুদ্দিন শেখ মুজিবের কৌসুলিরূপে জেরা করেন। জনাব সালাম খানের অনুপস্থিতিতে জনাব জহিরুদ্দিন যে জেরা করিবেন তাহা কোর্টকে পূর্বেই জানান হইয়াছিল।

ট্রাইবুনাল কক্ষে

২৪ অক্টোবর, ১৯৬৮

বিবাদী পক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব সালাম খান গতকালও বিশেষ ট্রাইবুনালে অধিকাংশ সময় উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহাকে অধিবেশন শুরু হইবার পর কিছুক্ষণ অবস্থান করিয়া অন্য কোর্টের মামলায় চলিয়া যাইতে হয়। তাঁহার স্থলে এডভোকেট জহিরুদ্দিন সাক্ষীদের জেরা করেন। অপরদিকে বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব মঞ্জুর কাদেরও গতকাল অধিবেশনের সময় অন্য কাজের জন্য অধিকাংশ সময় উপস্থিত থাকিতে সক্ষম হন নাই। তাঁহার স্থলে জনাব টি.এইচ. খান মামলা পরিচালনা করেন ।

উভয়পক্ষের প্রধান কৌসুলিদ্বয়ের ট্রাইবুনালে অনুপস্থিতি অনেকেই উপলব্ধি করিয়াছেন । ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি রহমান মাঝে মাঝে দুই

একটি অতীব উজ্জ্বল মন্তব্য করেন । গতকাল এক পর্যায়ে কৌসুলি জহিরুদ্দিন যখন সাক্ষী লুৎফুল হুদাকে তাঁহার বিবাহ সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রশ্ন করিতে যাইতেছিলেন, সেই সময় বিচারপতি রহমান হাস্যরোলের মধ্যে মন্তব্য করেন যে, জনাব আতাউর রহমান এই ব্যাপারে দক্ষ ব্যক্তি । ইতিপূর্বে জনাব খান দুইজন সাক্ষীকে তাঁহাদের বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়ে দীর্ঘ জেরা করিয়াছেন। বিচারপতি রহমান স্বাভাবিকভাবেই উক্ত রেফারেন্সে এই মন্তব্য করেন।

ট্রাইবুনাল কক্ষে

২৬ অক্টোবর, ১৯৬৮

বিশেষ ট্রাইবুনাল কক্ষে এখন হইতে প্রতি সোম ও শুক্রবার মহিলাদের গ্যালারীতে ভিড় বৃদ্ধি পাইতে শুরু করিয়াছে। অবশ্য মহিলা দর্শকদের মধ্যে শতকরা নব্বই জনই হইতেছেন অভিযুক্তদের স্ত্রী। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই প্রতিদিন অধিবেশনে উপস্থিত থাকিবার কার্ড রহিয়াছে। কিন্তু গত কিছুদিন যাবৎ অভিযুক্ত স্বামীদের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ কম থাকায় তাঁহাদের ভিড়ও কম ছিল।

এখন হইতে তাঁহারা কাঠগড়ার নিকট অধিবেশন শেষে স্ব-স্ব স্বামীর সাথে সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ পাইবেন—এই নির্দেশ মোতাবেক গতকাল শুক্রবার তাঁহারা সাক্ষাতের সুযোগ লইয়াছেন। চলতি সপ্তাহে পূর্ব নির্দেশ অনুযায়ী গত সোমবার তাঁহারা অনুরূপ সাক্ষাৎ করিতে পারেন। কিন্তু কেবলমাত্র অভিযুক্তদের পত্নীদেরই এই সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়া হইয়াছে।

অভিযুক্তদের কোন আত্মীয়া (মা, বোন, ভাবী ইত্যাদি) এই জাতীয় সাক্ষাতের সুযোগ পাইবেন না ।

সাক্ষী জালালউদ্দিনকে কৌসুলি জহিরুদ্দিন জেরা করার সময় এক পর্যায়ে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি ধূমপান বা চা পান করেন কিনা। বিচারপতি এম.আর খান মন্তব্য করেন, চা পান করিতে মিসকা (চট্টগ্রাম) হোটেলে চলে যান। দুই-একদিন পূর্বে সাক্ষী শহীদুল হক বলিয়াছিলেন যে, মিসকা হোটেলে তিনি মাঝে মাঝে চা পান করিতে যাইতেন । সম্ভবত সেই বক্তব্য স্মরণ করিয়াই তিনি উক্ত রসাত্মক মন্তব্য করেন।

ট্রাইবুনাল কক্ষে

১২ নভেম্বর, ১৯৬৮

বিশেষ ট্রাইবুনাল কক্ষে উৎসাহী দর্শক ও উল্লেখযোগ্য- সংখ্যক কৌসুলির আকর্ষণ যেন বহুলাংশে স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছে। বিবাদী পক্ষের কৌসুলিদের আসনে ওকালতনামা দস্তখত করেন নাই, এমন কোন কৌসুলিকে এখন আর সাধারণত দেখা যায় না । তাঁহাদের জন্য নির্দিষ্ট অধিকাংশ আসনই এখন শূন্য পড়িয়া থাকে। দর্শকদের গ্যালারীতে অভিযুক্তদের কয়েকজন স্ত্রী ও ডিউটিরত সরকারী কর্মচারীদেরই প্রধানত দেখা যায়। প্রকৃত দর্শকদের সংখ্যা বর্তমানে নগণ্য ।

শীত পড়িতে শুরু করিলেও এক নম্বর অভিযুক্ত ব্যক্তি শেখ মুজিবুর রহমান গলায় কেবলমাত্র একটি মাফলার জড়াইয়া ট্রাইবুনাল কক্ষে উপস্থিত হন। পাজামা-পাঞ্জাবি পরিহিত শেখ মুজিব অধিবেশন শুরু হইবার অল্প পূর্বে অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের অগ্রভাগে গতকাল কক্ষের কাঠগড়ায় উপস্থিত হইলে দর্শক ও কৌসুলিগণ তাঁহাকে দূর হইতে শুভেচ্ছা জানান ।

প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও সাবেক ভারপ্রাপ্ত সম্পাদিকা আমেনা বেগম গতকাল কক্ষে উপস্থিত ছিলেন। অধিবেশন শেষ হইবার পর তাঁহারা শুভেচ্ছা জানাইবার উদ্দেশ্যে শেখ মুজিরের সাথে অতি অল্প সময়ের জন্য সাক্ষাৎ করেন।

গতকাল ছিল অভিযুক্তদের পত্নীদের স্ব-স্ব স্বামীর সাথে সাক্ষাতের জন্য নির্দিষ্ট দিবস । অভিযুক্তদের স্ত্রীগণ অন্যান্য দিনের ন্যায় অধিবেশন শেষে কাঠগড়ার নিকট প্রায় দশ মিনিটকাল স্ব-স্ব স্বামীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। বেগম মুজিবুর রহমান গতকাল অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। তিনিও স্বামী শেখ মুজিবের সাথে কাঠগড়ার নিকট আলাপ করেন ।

বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব মঞ্জুর কাদের আজকাল অধিবেশন কক্ষে সাধারণত উপস্থিত থাকেন না। সম্ভবত তিনি এই মামলা সংক্রান্ত অন্য ব্যাপারে বর্তমানে ব্যস্ত রহিয়াছেন। তিনি অধিকাংশ সময় নিজের কক্ষে বসিয়া কাজ করিয়া থাকেন। তাঁহার স্থলে কৌসুলি টি.এইচ খান প্রধানত সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন ।

সাংবাদিকদের জন্য নির্দিষ্ট দ্বিতীয় গ্যালারীটি গতকাল সম্পূর্ণই শূন্য ছিল । কোন কোন সময় এই গ্যালারীতে দুই-একজন সংশ্লিষ্ট অফিসারও বসিয়া

থাকেন। বর্তমানে ট্রাইবুনালে প্রতিদিন সাক্ষীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং গতকাল এক ডজন সাক্ষীকে ট্রাইবুনালে উপস্থিত করা হয়। জবানবন্দী বা সাক্ষ্যদানের পর সাক্ষ্যের বিবরণী সংশোধনের জন্য সাক্ষীদের বসিবার স্থানের অভাব দেখা দেয়। গতকাল প্রথম উক্ত শূন্য গ্যালারীতে তাঁহাদের বসিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল ।

ট্রাইবুনাল কক্ষে

১৩ নভেম্বর, ১৯৬৮

এমন একজন সরকারী সাক্ষী গতকাল মঙ্গলবার বিশেষ ট্রাইবুনালের সম্মুখে সাক্ষ্য প্রদান করেন, যিনি ইংরাজী ভাল বুঝিতে সক্ষম নহেন এবং বাংলা জানেন না— স্বাভাবিকভাবেই উর্দুতে তাঁহাকে প্রশ্ন করা হয়। বিশেষ ট্রাইবুনালে এই প্রথম একজন সাক্ষীকে কোর্ট উর্দুতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। উক্ত সাক্ষী হইতেছেন করাচীর মনোরা পোস্ট অফিসের পোস্ট মাস্টার জনাব গুল ই জোয়াহের।

ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি এস.এ. রহমান নিজেই তাঁহাকে বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। ইতিপূর্বে কয়েকজন সরকারী সাক্ষীকে লইয়াও কোর্ট এই জাতীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। তাঁহারা ইংরাজীতে বক্তব্য প্রকাশ করিতে অক্ষম এবং উর্দু বুঝিতে পারেন না।

বাংলা ভাষাতেই কেবল তাঁহারা প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম। সেই সমস্ত ক্ষেত্রে কোর্টের সুবিধার জন্য সাক্ষীর বক্তব্য বাংলা হইতে দোভাষীর মাধ্যমে ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল। গত ১৮ অক্টোবর দশম রাজসাক্ষী এ.বি.এম. ইউসুফ (বৈরী ঘোষিত) জবানবন্দী দানের সময় কোর্টকে জানান যে, তিনি ইংরাজীতে বক্তব্য প্রকাশ করিতে পারেন না। তখন তাঁহার জবানবন্দী বাংলায় গ্রহণের প্রশ্ন ওঠে। প্রধান বিচারপতি সরাসরি বাংলায় জবানবন্দী গ্রহণের পরিবর্তে (কোর্টের সুবিচারের জন্য) দোভাষীর মাধ্যমে ইংরাজীতে সাক্ষীর বক্তব্য গ্রহণের পক্ষে মত দেন। কিন্তু সরকারীভাবে নিযুক্ত কোন দোভাষীর ব্যবস্থা করা যায় নাই। এমতাবস্থায় কোর্টের সহকারী রেজিস্ট্রার জনাব আতিয়া রহমানের উপর বাংলা হইতে ইংরাজীতে অনুবাদের দায়িত্ব পড়ে। সেই হইতে তিনি কেবলমাত্র বাংলা জানেন, এমন সাক্ষীদের জন্য দোভাষীর কাজ করিয়া আসিতেছেন । গত কিছুদিন যাবৎ তিনি যেন

নিয়মিত দোভাষীতে পরিণত হইয়াছেন।

বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব মঞ্জুর কাদের গতকালও ট্রাইবুনাল কক্ষে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহাকে অন্য কাজে ব্যস্ত থাকিতে হয়। বিবাদীগণের প্রধান কৌসুলি জনাব সালাম খানও গতকাল ট্রাইবুনালে বেশিক্ষণ ছিলেন না। তিনি অন্য কোর্টে উপস্থিত থাকিবার জন্য কিছুক্ষণ পর ট্রাইবুনাল কক্ষ ত্যাগ করেন।

ক্রমান্বয়ে কৌসুলির সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাইয়াছে। গতকাল বাদীপক্ষের ৫ জন কৌসুলির মধ্যে ২ এবং বিবাদী পক্ষে মাত্র ১০ জন কৌসুলি উপস্থিত ছিলেন।

ট্রাইবুনাল কক্ষে

১৪ নভেম্বর, ১৯৬৮

সরকারী সাক্ষী নোয়াব আলী (বৈরী সাক্ষী কামালউদ্দিনের সাবেক ড্রাইভার) অভিযুক্তদের কাঠগড়ায় স্টুয়ার্ড মুজিব ও লিডিং সিম্যান সুলতান উদ্দিনকে সনাক্ত করিতে ব্যর্থ হইবার পর কোর্টকে বলেন যে, ‘সনাক্ত করিতে পারিতেছি না।' তিনি কাঠগড়ার সম্মুখে যাইয়া সকল অভিযুক্তকে দেখিবার পর এই ব্যর্থতা প্রকাশ করেন ।

ইতিপূর্বেও কয়েকজন সাক্ষী কোন কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সনাক্ত করিতে পারেন নাই। কিন্তু গতকাল সনাক্তকরণের ব্যাপারে উক্ত সাক্ষী ব্যর্থতা প্রকাশ করিলে সরকার পক্ষের কৌসুলি জনাব টি.এইচ. খান সংশ্লিষ্ট অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কাঠগড়ার মধ্যে দাঁড়াইবার জন্য বলিতে কোর্টকে অনুরোধ করেন।

কোর্টের নির্দেশ মোতাবেক অভিযুক্তদের কাঠগড়ায় সুলতান উদ্দিন ও স্টুয়ার্ড মুজিব দাঁড়াইলে বাদী পক্ষের কৌসুলি টি.এইচ. খান বলেন যে, বর্তমানে তাঁহাদের দাড়ি হইয়াছে ।

ইতিপূর্বে সাধারণত কোন সাক্ষী কাহাকেও সনাক্ত করিতে না পারিলে সরকার পক্ষ সংশ্লিষ্ট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে বলেন নাই। এই প্রথম সংশ্লিষ্ট অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বর্তমানে দাড়ি হইয়াছে বলিয়া সরকারী কৌসুলি মন্তব্য করিলেন।

সোমবার ও শুক্রবার ছাড়া অন্যান্য দিবসে মহিলাদের গ্যালারীতে দর্শকের সংখ্যা গত কিছুদিন যাবৎ কম দেখা যাইতেছে। কারণ, উক্ত দুইটি দিবসে অভিযুক্তদের স্ত্রীগণ স্ব-স্ব স্বামীর সাথে ট্রাইবুনালের অধিবেশন শেষ হইবার পর সাক্ষাৎ করিতে পারেন।

কিন্তু কয়েকজন বিশেষ বিশেষ অভিযুক্ত ব্যক্তির স্ত্রীকে প্রত্যহ নিয়মিত ট্রাইবুনাল কক্ষে দর্শকদের গ্যালারীতে বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। সাক্ষাতের অনুমতি না থাকিলেও তাঁহারা আসেন এবং নির্দিষ্ট আসনে বসিয়া থাকেন প্রায় চারি ঘণ্টাকাল ।

অধিবেশন শেষে কৌসুলি, দর্শক, সরকারী কর্মচারী সকলেই ব্যস্ততার সাথে কক্ষ ত্যাগ করিতে থাকেন। সকলের পরে অভিযুক্তদের তরুণী পত্নীগণ অধিবেশন কক্ষ ত্যাগ করিয়া শহরের দিকে যাত্রা করেন। তখন অভিযুক্তগণও কাঠগড়ার বাহিরে গিয়াছেন নির্দিষ্ট গাড়িতে উঠিবার জন্য ।

ট্রাইবুনাল কক্ষে

১৫ নভেম্বর, ১৯৬৮

রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্যদের মামলায় বিশেষ ট্রাইবুনালে গতকাল বৃহস্পতিবার শততম সাক্ষীরূপে মনোবিজ্ঞানী অধ্যাপক এম.ইউ. আহমদ উপস্থিত হন। অধ্যাপক আহমদ পূর্ব পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সাবেক সদস্য। তিনি এডিপিআই রূপে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এক সময়ে তিনি ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার আজিমপুরস্থ ‘সাইকি’ বাড়ি ভাড়া সম্পর্কে তিনি সাক্ষ্য প্রদান করেন । গতকাল পর্যন্ত সর্বমোট একশত এগারজন সরকারী সাক্ষীকে ট্রাইবুনালের সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছে। সম্ভবত দেড় শতাধিক সাক্ষী সাক্ষ্য দিবেন এবং প্রায় আশিজনকে কেবল কোর্টে উপস্থিত করা হইবে।

এমন অনেক সাক্ষী আছেন যাঁহাদের কেবলমাত্র কোর্টে উপস্থিত করা হয়—জবানবন্দী নেওয়া হয় না এবং বিবাদী পক্ষও তাঁহাদের জেরা করিতে উৎসাহী থাকেন না। তবে তাঁহাদের শপথ গ্রহণ করান হয় ।

এমনই একজন সরকারী সাক্ষী হইতেছেন ঢাকার ক্যাসেরিনা হোটেলের পঞ্চান্ন বছর বয়স্ক বৃদ্ধ ‘বয়’ আবদুল করীম। নাম-ঠিকানা রেকর্ড করিবার ও

শপথগ্রহণের পর তাঁহাকে চলিয়া যাইতে বলা হয়। তাঁহাকে বিবাদী পক্ষ জেরা করিতে চাহেন নাই ।

এই সময় প্রবীণ কৌসুলি খান বাহাদুর মোহাম্মদ ইসমাইল হাস্যরোলের মধ্যে বলেন, মাই লর্ড, এই সাক্ষী ইতিমধ্যেই শপথ গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহার পর তাঁহার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় নাই। তিনি এখন শপথ লইয়াই বাড়ি চলিলেন। সারাদিনই তাঁহাকে সত্য কথা বলিতে হইবে। (শপথের অংশ : ... সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলিব না) ।

বিবাদী পক্ষের কৌসুলি জনাব জহিরুদ্দিন জনৈক সরকারী সাক্ষীকে ঢাকা কুমিল্লা রোডের ফেরীঘাট সম্পর্কে প্রশ্ন করিতেছিলেন। এক পর্যায়ে সরকারী নির্দেশ সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের নিকট প্রেরণের পদ্ধতিগত প্রশ্নের ব্যাপারে দ্বিমত দেখা দেয়। সেই সময় বিচারপতি রহমান হাসিয়া মন্তব্য করেন যে, জনাব জহিরুদ্দিনের অভিজ্ঞতা (প্রশাসনের) ছিল—তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। (কৌসুলি আওয়ামী লীগ আমলে কিছুকালের জন্য কেন্দ্রীয় উজির ছিলেন)।

ট্রাইবুনাল কক্ষে

১৬ নভেম্বর, ১৯৬৮

নির্ধারিত সাক্ষাতের দিন ট্রাইবুনালের অধিবেশন শেষ হইবার পর অভিযুক্তদের স্ত্রীগণ স্ব-স্ব স্বামীকে নাস্তা- জাতীয় খাদ্য সরবরাহ করিবার সুযোগ পাইতেছেন। গত কিছুদিন যাবৎ এই সুযোগ দেওয়া হইতেছে।

অধিবেশন শেষে সাক্ষাতের পূর্বে খাদ্যের প্যাকেটগুলি ডিউটিরত পুলিশ অফিসারের হাতে তুলিয়া দিতে হয়। তিনি পরবর্তীকালে প্যাকেটগুলি প্রাপকদের নিকট পৌঁছাইবার ব্যবস্থা করেন। গতকাল ছিল সাক্ষাতের দিন। স্বাভাবিকভাবেই মহিলাদের গ্যালারী ছিল পরিপূর্ণ। জনৈক অভিযুক্ত সামরিক অফিসারের তরুণী স্ত্রীর হাতে ছিল খাদ্যের একটি প্যাকেট। বাদামী রঙের কাগজে মোড়া প্যাকেটটি তিনি ঢাকা হইতে বহন করিয়া আনিয়াছিলেন। অধিবেশন শেষ হইবার পর কাঠগড়ার নিকট স্বামীর সাথে প্রতীক্ষিত সাক্ষাতের পূর্ব মুহূর্তে পুলিশ অফিসারের হাতে তিনি প্যাকেটটি তুলিয়া দেন। দুই পা আগাইয়া যাইয়া তিনি ফিরিয়া আসেন, বলেন, 'দেখুন, ওর কাছে দেবেন।' শিক্ষিতা রমণীর আদলে যেন উৎকণ্ঠার ছাপ। সাক্ষাতের পর অন্যদের সাথে তিনি ফিরিয়া আসিতেছিলেন। পুলিশ অফিসার দাঁড়াইয়াছিল। উৎফুল্ল সেই

তরুণী স্ত্রী তাঁহাকে পুনরায় বলিলেন, “বুঝলেন, ওর কাছে দেবেন।'

‘এক মিনিট পরে আসিতেছি।' এই কথার প্রকৃত অর্থ অন্তত কয়েক মিনিট পর তিনি আসিবেন। ‘আর এক সেকেন্ড।' এই কথাটির অর্থ সবসময়ই কমপক্ষে দুই এক মিনিট হইয়া পড়ে। সম্ভবত ঠিক তেমনই ভাবে ‘আর একটি প্রশ্ন।' এর অর্থ একটিতে সীমাবদ্ধ নয়, বহু প্রশ্ন হইতে পারে। বিবাদী পক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব সালাম খানের ‘একটি প্রশ্ন' অন্তত তাহাই প্রমাণ করিয়াছে। গতকাল অধিবেশন শেষ হইবার সময় তিনি ট্রাইবুনালকে বলেন যে, জনৈক সাক্ষীকে তিনি আর একটি প্রশ্ন করিবেন। সাক্ষী ফেনী থানার এস.আই আলতাফ হোসেনকে তিনি জেরা করিতেছিলেন। কৌসুলি জনাব খান সাক্ষীকে একটি প্রশ্ন করিবার পর বিচারপতি জনাব এম.আর খান হাসিয়া বলেন যে, ‘আপনি আর একটি প্রশ্ন করিতে চাহিয়াছিলেন।' কৌসুলি খান একটি মূল প্রশ্নকে কেন্দ্র করিয়া শেষ পর্যন্ত পরপর আটটি প্রশ্ন করেন।

ট্রাইবুনাল কক্ষে

১৯ নভেম্বর, ১৯৬৮

বিশেষ ট্রাইবুনালের অন্যতম সদস্য বিচারপতি এম.আর. খান গতকাল সোমবার অধিবেশনে যোগদান করিতে পারেন নাই। এই প্রথম তিন সদস্যবিশিষ্ট ট্রাইবুনালে একজন বিচারপতি অনুপস্থিত ছিলেন।

বিচারপতি জনাব এম.আর. খান সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি পিন্ডিতে শপথ গ্রহণের জন্য গমন করিয়াছেন বলিয়া ট্রাইবুনালে উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই । তবে তিনি বর্তমান মামলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিশেষ ট্রাইবুনালের বিচারপতি হিসাবে কাজ করিয়া যাইবেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি এস. এ. রহমান ও বিচারপতি মুখসুমুল হাকিম কার্য পরিচালনা করেন। বিচারপতি এম.আর. খানের আসনটি শূন্য ছিল।

প্রধান অভিযুক্ত ব্যক্তি শেখ মুজিবের প্রথমা কন্যার বিবাহের মিষ্টি গতকাল অধিবেশন শেষে শেখ ছাহেবের নিকট দেওয়া হইয়াছে। কোর্টের অনুমতি লইয়া এই মিষ্টি প্রদান করা হয়।

বিরতির পর ট্রাইবুনাল পুনরায় শুরু হইলে বিবাদী পক্ষের কৌসুলি ব্যারিস্টার

কে.জেড.আলম কোর্টের নিকট উক্ত মিষ্টি প্রদানের মৌখিক আবেদন করিয়া বলেন যে, এই মিষ্টি যাহাতে শেখ ছাহেব অন্যদের (অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তি) লইয়া খাইতে পারেন, সেইজন্য কিছুটা বেশি পরিমাণ আনা হইয়াছে। কোর্ট পুলিশের নিকট মিষ্টি প্রদানের কথা বলেন এবং অধিবেশন শেষ হওয়ার পর টিফিন ক্যারিয়ারে করিয়া কন্যার বিবাহের মিষ্টি কাঠগড়ার নিকট শেখ ছাহেবের হাতে তুলিয়া দেওয়া হয় ।

উল্লেখ যে, গত রবিবার রাত্রে শেখ মুজিবের প্রথমা কন্যা (শেখ হাসিনার) বিবাহ নিরানন্দময় পরিবেশে সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত বিবাহে শেখ ছাহেবকে উপস্থিত থাকিবার অনুমতিদানের প্রার্থনা করিয়া প্যারলে মুক্তির আবেদন করা হাইয়াছিল। শেখ ছাহেব উক্ত বিবাহে উপস্থিত ছিলেন না ।

বহুশত পৃষ্ঠার একটি বিশাল প্রকৃতির লেজার বুক তিনজনে বহন করিয়া ট্রাইবুনালের এজলাসে বিচারকদের সম্মুখে উপস্থিত করেন। ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংকের আগ্রাবাদ (চট্টগ্রাম) শাখা অফিসের এই বিশাল লেজার বুকটি মামলার প্রয়োজনে কোর্টে উপস্থিত করা হয়। ইহাকে এজলাসের উপর হইতে নামাইবার সময়ও তিনজনকে আগাইয়া আসিতে হয়।

অভিযুক্তদের স্ত্রীগণ গতকাল নির্ধারিত দিবসে কাঠগড়ার নিকট স্ব-স্ব স্বামীর সাথে সাক্ষাৎ করেন ।

ট্রাইবুনাল আমি কক্ষে

২০ নভেম্বর, ১৯৬৮

বেশ কয়েকদিন যাবৎ শীত পড়িলেও বিশেষ ট্রাইবুনাল কক্ষে প্রবেশের পর তাহা অনুভব করা যাইত না । এতদিন পর্যন্ত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা ছিল। গতকাল মঙ্গলবার শীতাতপ নিয়ন্ত্রক যন্ত্রগুলি আর সমবেত কণ্ঠে একঘেয়ে সঙ্গীতের সৃষ্টি করে নাই। যন্ত্রগুলিকে মূক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অধিবেশন কক্ষের আবহও ঠাণ্ডা রাখার প্রয়োজন ফুরাইয়া গিয়াছে ।

কক্ষের জানালাগুলি গতকাল খুলিয়া দেওয়া হয় এবং ইহার ফলে কক্ষের পরিবেশ অনেকটা ভিন্ন রূপ ধারণ করে ।

বহু অর্থ ব্যয়ে শীতাতপ নিয়ন্ত্রক যন্ত্রের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল । এই সমস্ত যন্ত্রের শব্দের দরুন বিশেষ করিয়া দর্শকদের পিছনের গ্যালারী হইতে সাক্ষী-

কৌসুলিদের প্রশ্নোত্তর অধিকাংশ সময়েই স্পষ্ট শোনা যাইত না। গতকাল যন্ত্রগুলির বিরক্তিকর শব্দ না থাকায় দর্শকদের পক্ষেও ট্রাইবুনালের কার্যবিবরণী সঠিকভাবে শ্রবণ করা সম্ভব হইয়াছে ।

জনৈক ডিএসপিকে গতকাল সরকার পক্ষে সাক্ষ্যদানকালে বিবাদী পক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব সালাম খান এক পর্যায়ে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র পুস্তক সম্পর্কে প্রশ্ন করিতে চাহেন।

বিচারপতি রহমান তখন বলেন যে, সাক্ষী (ডিএসপি) শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত আইনজীবী নহেন ।

বিশেষ ট্রাইবুনালের অন্যতম সদস্য-বিচারপতি ও সুপ্রীম কোর্টের নবনিযুক্ত বিচারপতি জনাব এম আর খান গতকালও কোর্টে যোগদান করেন নাই । তিনি শপথ গ্রহণের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি পিন্ডি গিয়াছেন ।

পূর্ব পাকিস্তান পুলিশের সাবেক ডিআইজি জনাব আবদুল্লাহ বর্তমানে হাইকোর্টের একজন কৌসুলি। তিনি রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্যদের মামলার জনৈক অভিযুক্ত ব্যক্তির কৌসুলিরূপে প্রত্যহ বিশেষ ট্রাইবুনালে উপস্থিত থাকেন। এই মামলার বহু সাক্ষীকে তিনি জেরা করিয়াছেন।

কিন্তু গতকাল পুলিশের সাবেক ডিআইজি কৌসুলি জনাব আবদুল্লাহ এমন একজন সাক্ষীকে জেরা করেন, যিনি পুলিশের ডেপুটি সুপার (বরিশালের ডিএসপি জনাব গোলাম মেহেদী চৌধুরী)।

ট্রাইবুনাল কক্ষে

২১ নভেম্বর, ১৯৬৮

ছোট্ট ছেলে ওয়ালী।

মডেল স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র ওয়ালী বন্দী পিতাকে দেখিতে গিয়াছিল বিশেষ ট্রাইবুনালে ।

‘রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্যদের মামলা'র দ্বিতীয় অভিযুক্ত ব্যক্তি কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র ওয়ালী। সাড়ে আট বছরের বালক ওয়ালী গতকাল বুধবার বিশেষ ট্রাইবুনাল কক্ষে সর্বকনিষ্ঠ দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলো ।

তখনও ট্রাইবুনালের অধিবেশন শুরু হয় নাই। এইমাত্র মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কাঠগড়ায় আনা হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে অভিযুক্ত কমান্ডার মোয়াজ্জেমও রহিয়াছেন । মহিলা দর্শকদের গ্যালারীতে উপস্থিত বেগম মোয়াজ্জেমের পাশ হইতে একটি বালক কাঠগড়ার দিকে ছুটিয়া আসে। সপ্রতিভ বালক ওয়ালী কাঠগড়ার রেলিংয়ের ব্যবধানে পিতার নিকট আসিয়া দাঁড়ায় ।

কাঠগড়ার রেলিংয়ের উচ্চতা ওয়ালীকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। অভিযুক্ত মোয়াজ্জেম হোসেন শির স্পর্শ করিয়া পুত্রকে স্নেহাশীষ জানান ।

ওয়ালীর মাতা ছিলেন দূরে দর্শকের গ্যালারীতে উপবিষ্টা। সমস্ত কক্ষের কৌসুলি, দর্শক ও সরকারী কর্মচারীদের দৃষ্টি তখন নিবদ্ধ ছিল পিতা-পুত্রের সাক্ষাতের দৃশ্যের দিকে। অনেকদিন ওয়ালী তাহার পিতাকে দেখে নাই। পার্শ্বে বিচারপতিদের এজলাস, তাঁহার পিছনে কালো কোট ও টাই পরিহিত কৌসুলিদের সারি আর অপরিচিত বহু লোকের মধ্যে কাঠগড়ায় তাহার পিতা। এমন একটি পরিবেশের মধ্যে ওয়ালী তাহার পিতাকে আর কোন দিন দেখে নাই । স্কুলের ছুটির অবসরে ওয়ালী এই প্রথম ট্রাইবুনালের কাঠগড়ায় পিতাকে দেখিতে আসিয়াছিল।

ট্রাইবুনালের অন্যতম সদস্য বিচারপতি জনাব এম. আর. খান গতকালও অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন না। গত সোমবার হইতে তিনি অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকিতেছেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে বিচারপতি মখসুমুল হাকিম মামলার কার্যবিবরণীর 'মেমোরেন্ডাম' লিপিবদ্ধ করেন। ইতিপূর্বে বিচারপতি এম. আর. খানই 'মেমোরেন্ডাম' রাখিতেন ।

ট্রাইবুনাল কক্ষে

২২ নভেম্বর, ১৯৬৮

দশ বৎসরের মেয়ে শাহীনকে হয়ত সবাই জানেন না । কিন্তু তাহার বড় চাচা, বাবা ও মা'র নাম পৃথক পৃথক কারণে সম্ভবত সকলে জানেন ।

সেই শাহীন গতকাল বৃহস্পতিবার বিশেষ ট্রাইবুনালে গিয়াছিল—তাহার বাবাকে দেখিতে। সিনিয়র সিএসপি অফিসার মামলার অন্যতম অভিযুক্ত ব্যক্তি পিতা শামসুর রহমানের সঙ্গে শাহীন কাঠগড়ার নিকট সাক্ষাৎ করে। এককালে

মেধাবী ছাত্র বন্ধু মহলে ‘ডক্টর জনসন' নামে পরিচিত সিএসপি শামসুর রহমান যখন কাঠগড়ার নিকট কন্যার সহিত অন্তরঙ্গ আলাপে লিপ্ত ছিলেন, সেই সময় শাহীনের পাশে যিনি দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক উজিরে আলা জনাব আতাউর রহমান খান। শাহীনের ‘বড় চাচা' জনাব আতাউর রহমান ট্রাইবুনালে উপস্থিত ছিলেন অনুজের কৌসুলি হিসাবে।

একটু দূরেই মহিলাদের গ্যালারীতে বসিয়াছিলেন শাহীনের মা—পূর্ব পাকিস্তানের প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়িকা আফসারী খানম। তিনি আজ প্রথমা সন্তান শাহীনকে লইয়া স্বামীকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। প্রতিদিনই তাঁহাকে দর্শকদের গ্যালারীতে উপস্থিত থাকিতে দেখা যায়। এক সময় যাঁহার গান শোনার জন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দর্শকদের ভিড় জমিত, সুধী সমাজের ঘরে ঘরে যাঁহার কণ্ঠ নিঃসৃত সঙ্গীত শোনার জন্য রেডিও বাজিত, সেই আফসারী খানমকে এখন আর বেতারের অনুষ্ঠানে গান গাহিনার জন্য আহ্বান জানানো হয় না। তাঁহাকে টেলিভিশন কর্তৃপক্ষও উপেক্ষা করিতে দ্বিধাবোধ করেন না। আজ আকস্মিকভাবে তাঁহার প্রতি কেন অবহেলা, তাহা কেবল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছেই বোধগম্য ।

বিশেষ ট্রাইবুনালের কার্যবিবরণীর এক হাজার পৃষ্ঠা গতকাল পূর্ণ হইয়াছে। গতকাল পর্যন্ত ফুলস্কেপ কাগজের টাইপ করা কার্যবিবরণীর পৃষ্ঠাসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে এক হাজার এক ।

ট্রাইবুনাল কক্ষে

২৩ নভেম্বর, ১৯৬৮

ট্রাইবুনাল কক্ষের সকল কৌসুলি ও দর্শকগণ যখন স্ব- স্ব আসনের নিকট দাঁড়াইয়াছেন এবং বিচারপতিগণ যখন কক্ষ ত্যাগ করিয়াছেন, সেই সময় ভিড় ঠেলিয়া গুটিগুটি পা বাড়াইয়া একটি ছোট মেয়ে আগাইয়া আসে – সিপা মেয়েটি ।

অদ্ভুত মিষ্টি হাসি তার মুখে। সে তার সম্মুখে একটু দূরেই একজনকে দেখিয়াছে— আশপাশের আর কাহাকেও যেন সে দেখিতে পায় নাই। সরাসরি অভিযুক্তদের কাঠগড়ার নিকট সে উপস্থিত হয় বাবার সম্মুখে। ‘রাইচরণের খোকাবাবু'র চৌকাঠ পার হইবার ন্যায় সিপাও যেন এক অসাধ্য সাধন করিয়াছে।

কাঠগড়ার রেলিংয়ের পাশ হইতে কি করিয়া পাঁচ বছরের মেয়ে সিপা বাবার কোলে চড়িবে ? তাহাকে বাবার একান্ত কাছে যাইতেই হইবে। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে অভিযুক্তদের কাঠগড়ার অভ্যন্তরে জনসংখ্যা (৩৫ জন অভিযুক্ত ব্যক্তি) বৃদ্ধি পাইবে।

পিতা কমান্ডার মোয়াজ্জেম স্নেহময়ী কন্যার আকর্ষণ এড়াইতে পারেন নাই— সিপাকে তিনি রেলিংয়ের উপর তুলিয়া বসান (উপস্থিত সরকারী কর্মচারীদের মৌনসম্মতি)। সুউচ্চ রেলিংয়ের উপর উপবিষ্টা সিপা যেন সমগ্র কক্ষের শাসনকর্ত্রী—সম্রাজ্ঞী সুলতানা রিজিয়ার তরবারি তখন তাহার হাতে ছিল না।

কিন্তু পিতার সাথে কথোপকথনের সময় শেষ হইয়া আসিল। মা পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। অধিবেশন শেষে গতকাল পূর্ব নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য অভিযুক্তদের স্ত্রীগণও কাঠগড়ার পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছেন, মার সাথে এখন তাহাকে বাড়ি ফিরিতে হইবে: নির্বাক সিপা রেলিংয়ের উপর হইতে নামিয়া আসিল বাড়ি ফিরিবার উদ্দেশ্যে। এক সময় বাবা অফিসে যাইতেন তাহাকে ফেলিয়া—গতকাল সিপা বাবাকে ফেলিয়া বাড়ি ফিরিয়াছে।

তরুণ ব্যারিস্টার জনাব কে.জেড. আলম ট্রাইবুনালের বর্তমান মামলা শুরু হইবার প্রথম দিন হইতেই বিবাদী পক্ষের অন্যতম কৌসুলি হিসাবে কাজ করিতেছেন। তবে তাঁহাকে অধিবেশন চলিবার সময় সর্বক্ষণই বিবাদীপক্ষের কৌসুলি জনাব আবদুস সালাম খানকে মামলা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সরবরাহের কাজে নিবদ্ধ থাকিতে হয় এবং তিনি মামলার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করেন। গতকাল পর্যন্ত কোন দিন তিনি কোন অধিবেশনে অনুপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু গতকালই প্রথম তিনি এই মামলায় সরকারী সাক্ষী পিআইএর (রিজার্ভেশন সুপার) সৈয়দ আনিসুজ্জামানকে জেরা করেন।

ট্রাইবুনালের বিচারপতি জনাব এম. আর. খান গতকাল পর্যন্ত চলতি সপ্তাহের পাঁচদিন অধিবেশনেই অনুপস্থিত ছিলেন। বিচারপতি খান গত সোমবার পিন্ডিতে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরূপে শপথ গ্রহণের পর ঢাকায় ফিরেন নাই বলিয়া জানা যায়।

কয়েকদিন পূর্বে কক্ষের শীতাতপ নিয়ন্ত্রক যন্ত্রগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু পুনরায় কিছুটা গরম অনুভূত হইবার দরুন আংশিক শীতাতপের ব্যবস্থা করা হইয়াছে ।

ট্রাইবুনাল কক্ষে

২৬ নভেম্বর, ১৯৬৮

সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিরূপে শপথগ্রহণের পর বিচারপতি এম.আর. খান গতকাল প্রথম বিশেষ ট্রাইবুনালে বিচারকের আসন গ্রহণ করেন। গত ১৮ নভেম্বর বিচারপতি খান পিন্ডিতে সুপ্রীম কোর্টের অন্যতম বিচারপতিরূপে শপথ গ্রহণ করেন।

গত সপ্তাহের অধিবেশনের পাঁচদিন বিচারপতি এম.আর. খান ট্রাইবুনালে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহার অবর্তমানে ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি এস.এ. রহমান ও অন্যতম সদস্য বিচারপতি মখসুমুল হাকিম অধিবেশনের কাজ চালান। বর্তমানে বিশেষ ট্রাইবুনালের অন্যতম সদস্য একজন সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হইলেন। ইতিপূর্বে ট্রাইবুনালের দুইজন সদস্যই (চেয়ারম্যান ব্যতীত) ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন । গত সপ্তাহে শীত পড়িতে শুরু করিলেও ঢাকায় পুনরায় কিছুটা উষ্ণ আবহাওয়া অনুভূত ' হইতেছে। বিশেষ ট্রাইবুনাল কক্ষের শীতাতপ নিয়ন্ত্রক যন্ত্রগুলি গত সপ্তাহের প্রথম দিকে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তবে সপ্তাহের শেষের দিক হইতে আংশিক শীতাতপের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু গতকাল সোমবার হইতে কিছুটা গরম পড়ায় ট্রাইবুনাল কক্ষে পুনরায় পূর্ণ শীতাতপ ব্যবস্থা চালু করা হইয়াছে।

বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব মঞ্জুর কাদের বর্তমানে ট্রাইবুনাল কক্ষে উপস্থিত থাকেন না বলিলেই চলে । তাঁহার স্থলে প্রধানত কৌসুলি টি.এইচ. খান বাদীপক্ষের মামলা পরিচালনা করেন। জনাব মঞ্জুর কাদেরকে মামলা পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যাপারে তাহার কক্ষে সর্বদা ব্যস্ত থাকিতে হয়। প্রকাশ, প্রতিদিন দশ হইতে বারজন সাক্ষী যে সাক্ষ্যদান করিবে, সেই সম্পর্কে বাদীপক্ষ পূর্বে ধারণা করিতে পারেন নাই । ফলে প্রতিদিন প্রায় এক ডজন সাক্ষীকে ট্রাইবুনালের সম্মুখে উপস্থিত রাখার জন্য বাদীপক্ষকে ব্যস্ত থাকিতে হয় । এই সমস্ত সাক্ষীদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সমন জারি করিয়া নির্দিষ্ট দিবসে ট্রাইবুনালের সম্মুখে উপস্থিত করা বাদীপক্ষের দায়িত্ব। জনাব কাদেরকে এই ব্যাপারেও ব্যস্ততার মধ্যে কাটাইতে হয় ।

অভিযুক্তদের স্ত্রীগণ অন্যান্য সোমবারের ন্যায় গতকালও অধিবেশন শেষে কাঠগড়ার নিকট স্ব-স্ব স্বামীর সাথে সাক্ষাৎ করার সুযোগ পান। অন্যান্য দিন

এই সাক্ষাতের সময় প্রহরারত পুলিশকে কাঠগড়ার পাশেই দাঁড়াইয়া দায়িত্ব পালন করিতে দেখা যায় । কিন্তু গতকাল পুলিশ কাঠগড়া হইতে কিছুটা সম্ভ্রমজনক দূরত্বে দাঁড়াইয়া ডিউটিরত ছিলেন।

ট্রাইবুনাল কক্ষে

২৭ নভেম্বর, ১৯৬৮

গুরুগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে ট্রাইবুনালে যখন গুরুত্বপূর্ণ বিচারকার্য চলিতে থাকে, সেই সময় রুচিসম্মত হাস্যাত্মক উক্তি স্বাভাবিকভাবেই ক্ষণকালের জন্য হইলেও লঘু পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। বিচারপতি এম.আর. খান মাঝে মাঝে রুচিসম্মত রসাত্মক উক্তি করিয়া ট্রাইবুনাল কক্ষের পরিবেশ কিছুটা হালকা করেন। উপযুক্ত সময়ে উচ্চারিত তাঁহার কোন কোন উক্তি বহুদিন পর্যন্ত দর্শক ও কৌসুলির স্মরণে থাকিবে। বিচারপতি রহমানও মাঝে মাঝে এই জাতীয় রসাত্মক উক্তি করিয়া থাকেন।

গতকাল মঙ্গলবার ট্রাইবুনালের অধিবেশনের সময় বিবাদী পক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব সালাম খান জনৈক সরকারী সাক্ষীকে একটি ডামী (নকল) হাতবোমা সম্পর্কে প্রশ্ন করিতেছিলেন। তরুণ ব্যারিস্টার কে. জেড. আলম তাঁহাকে বিভিন্ন তথ্য সরবরাহের কাজে লিপ্ত ছিলেন। একপর্যায়ে তিনি জনাব সালাম খানকে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া মামলা সংক্রান্ত কোন কিছু বলিতেছিলেন। সেই সময় বিচারপতি এম.আর. খান জিজ্ঞাসা করেন : 'আপনাদের দুইজনের মধ্যে ডামী কে ?' তাঁহার এই উক্তিতে কক্ষের সকলেই হাসিতে ফাটিয়া পড়েন।

ট্রাইবুনাল কক্ষে কৌসুলি ও দর্শকদের সংখ্যা অনেকাংশে হ্রাস পাইলেও অধিবেশনের সময় নিম্নস্বরে আলাপের গুঞ্জরন কমে নাই, এই গুঞ্জরন এক এক সময় এত বেশি হয় যে, কোন কোন অবস্থায় বিচারপতিদের পর্যন্ত কথা কম বলিবার জন্য অনুরোধ করিতে হইয়া থাকে।

নিম্নস্বরের গুঞ্জরনের দরুন অনেক সময়ই দর্শকদের গ্যালারী হইতে কৌসুলি-সাক্ষীদের মধ্যকার প্রশ্নোত্তর সুস্পষ্টভাবে শোনা যায় না । গতকালও কয়েকবার কক্ষে এই শ্রেণীর গুঞ্জরন শোনা যায়। ফলে ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি রহমানকে বলিতে হয় : 'অনুগ্রহ করিয়া কথা কম বলুন।'

কিছুটা শীত পড়িবার পর হইতে সকলেই কোন না কোন ধরনের হালকা গরম কাপড় পরিয়া উপস্থিত হইতেছেন। জাম্পার, সোয়েটার, চাদর, ওয়েস্ট কোট ও সুট পরিয়া দর্শক, সরকারী কর্মচারী ও অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ কোর্টে উপস্থিত হইয়া থাকেন ।

বিচারপতি ও কৌসুলিদের পোশাকের ধরন পরিবর্তিত হয় নাই—তবে তাহাদের পূর্বের পোশাক সুতীর পরিবর্তে পশমী, অভিযুক্তগণ বিভিন্ন ধরনের পোশাক পরিয়া আসিতেছেন। গত কয়েকদিন যাবৎ এক নম্বর অভিযুক্ত ব্যক্তি শেখ মুজিবকে 'প্রিন্স কোট' পরিয়া আসিতে দেখা যাইতেছে।

ট্রাইবুনাল কক্ষে

২৮নভেম্বর, ১৯৬৮

বিশেষ ট্রাইবুনালে গতকাল বুধবারই প্রথম পূর্বাহ্ণে তালিকাভুক্ত সাক্ষীর অভাব পড়িয়াছিল। বাদীপক্ষ গতকল্যকার অধিবেশনের শেষের দিকে যে দুইজন সাক্ষীকে সাক্ষ্যদানের জন্য কাঠগড়ায় উপস্থিত করিতে চাহিয়াছিলেন তাহাদের নাম পূর্বাহ্ণে সাক্ষীদের তালিকাভুক্ত ছিল না বলিয়া ট্রাইবুনাল উক্ত সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে রাজি হন নাই ।

অধিবেশন শেষ হইবার মাত্র পাঁচ মিনিট পূর্বে এগারজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্ত হয় এবং বাদীপক্ষের কৌসুলি টি.এইচ. খান পরবর্তী যে দুইজন সাক্ষীকে কাঠগড়ায় উপস্থিত করেন, তাঁহাদের নাম পূর্ব ঘোষিত তালিকায় ছিল না। ইহার ফলে গতকাল বিশেষ ট্রাইবুনালের অধিবেশন দুই মিনিট পূর্বে সমাপ্ত হইয়া যায়। ইতিপূর্বে অধিবেশন সাক্ষীর অভাবে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে কখন সমাপ্ত হয় নাই ।

ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি রহমান বাদীপক্ষের কৌসুলিকে বলেন যে, ..সাক্ষীদের তালিকা পূর্বেই দিতে হইবে। আপনি আকস্মিকভাবে সাক্ষী উপস্থিত করিতে পারেন না । ইহাতে বিবাদী পক্ষের আপত্তি রহিয়াছে। বিচারপতি এম. আর. খান রসাত্মক উক্তি করিয়া বলেন যে, নম্বরবিহীন টেলিফোন রাখায় আপনাদের আপত্তি রহিয়াছে, নম্বরবিহীন সাক্ষী উপস্থিত করিলে তাহাতে বিবাদী পক্ষের আপত্তি থাকিতে পারে। (জনৈক অভিযুক্ত ব্যক্তির নম্বরবিহীন টেলিফোন ছিল বলিয়া অভিযোগ রহিয়াছে)।

কতিপয় অভিযুক্ত ব্যক্তির ‘সার্ভিস বুক’ উপস্থিত করার প্রয়োজনে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থান হইতে বেশকিছুসংখ্যক সরকারী কর্মচারীকে (সামরিক) বাদীপক্ষ গতকাল সাক্ষ্যদানের জন্য কোর্টে উপস্থিত করেন। এই ব্যাপারে বিচারপতি রহমান এক পর্যায়ে বলেন যে, ‘সার্ভিস বুকে'র সনাক্তের জন্য অর্থ ও সময় ব্যয় করার প্রয়োজন ছিল না।

বিচারপতি এম আর খান ‘সার্ভিস বুক' সম্পর্কে জনৈক সাক্ষীর সাক্ষ্যদানের সময় কৌসুলি টি এইচ খানকে উদ্দেশ করিয়া বলেন যে, আপনি মক্ষিকা সংগ্রহের জন্য এটম বোমা ব্যবহার করিতেছেন।

গতকাল যে এগারজন সাক্ষ্যদান করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে দশজনই সামরিক বিভাগে বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত। এই সমস্ত অফিসারের মধ্যে দুইজন স্কোয়াড্রন লীডার, দুইজন লেঃ কমান্ডার, ছয়জন মেজর রহিয়াছেন ।

ট্রাইবুনাল কক্ষে

২৯ নভেম্বর, ১৯৬৮

সরকারী সাক্ষীর অভাবে বিশেষ ট্রাইবুনালের অধিবেশন গতকাল বৃহস্পতিবার নির্ধারিত সময়ের আটচল্লিশ মিনিটকাল পূর্বেই সমাপ্ত হইয়া যায়। দুইশত তিন নম্বর সাক্ষী জনাব জহুরুল হকের সাক্ষ্যদানের পর বাদীপক্ষের কৌসুলি জনাব টি.এইচ. খান কোর্টকে জানান যে, আর কোন সাক্ষী উপস্থিত নাই—তখন বেলা এগারটা পঞ্চান্ন মিনিট।

সাক্ষীদের তালিকা, রাজসাক্ষীদের বর্তমান অবস্থান ও এই সমস্ত ব্যাপারে কোর্টের নির্দেশ ইত্যাদির জন্য সতের মিনিটকাল অতিবাহিত হয় এবং বারটা বার মিনিটের সময় কোর্ট অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা করেন। ইতিপূর্বে কোনদিন এত দীর্ঘ সময় পূর্বে কোর্টের অধিবেশন মুলতবি করা হয় নাই। সাধারণত বেলা একটা পর্যন্ত অধিবেশন চলে ।

সরকারী সাক্ষী শেখ আমজাদ আলী ছিলেন দুইশত নম্বর সাক্ষী। বিচারপতি জনাব এম আর খান উক্ত সাক্ষীর সাক্ষ্যদানের পর মন্তব্য করেন যে ‘ডবল সেঞ্চুরী। '

উল্লেখ্য যে, একশত নম্বর সাক্ষী ছিলেন প্রাদেশিক পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সাবেক সদস্য জনাব এম ইউ আহমদ ।

বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব মঞ্জুর কাদের গতকালও অধিবেশন কক্ষে উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। তিনি হাইকোর্টে একটি মামলার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। অধিবেশন শুরু হইবার অল্প পরেই বিচারপতি রহমান বাদীপক্ষের নিকট সাক্ষীদের তালিকা চাহেন । সরকারী কৌসুলি জনাব টি.এইচ. খান কোর্টকে জানান যে, এই ব্যাপারে তিনি এক্ষুণি কিছু বলিতে সক্ষম নহেন। সেই সময় বিচারপতি রহমান কৌসুলি জনাব মঞ্জুর কাদেরকে কোর্টে আগমনের খবর দিতে বলেন। কৌসুলি খান জানান যে, জনাব মঞ্জুর কাদের ঢাকাতেই রহিয়াছেন। কিন্তু তিনি এখন কোর্ট এলাকায় নাই। তবে আমি তাঁহার নিকট লোক পাঠাইয়াছি। অধিবেশন শেষ হইবার পূর্বে পুনরায় সাক্ষীদের তালিকা সম্পর্কে কোর্ট জানিতে চাহেন এবং বিচারপতি রহমান এক পর্যায়ে মন্তব্য করিয়া বলেন যে, ইহা অত্যন্ত অসন্তোষজনক ব্যবস্থা —এই কথা জনাব মঞ্জুর কাদেরকে জানাইবেন। জনাব টি এইচ খান কোর্টকে জানান, জনাব মঞ্জুর কাদেরের নিকট জনৈক ইন্সপেক্টর পাঠান হইয়াছিল। তিনি এখন হাইকোর্টের মামলায় কর্মরত রহিয়াছেন ।

ইহার পর তিনি পুনরায় কোর্টকে বলেন : আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছি। বিচারপতি রহমান : আমি এই ব্যাপারে সন্তুষ্ট নহি ।

ঢাকায় টিএন্ডটি কলেজের পনের বছর বয়সের তরুণ আই.এ. ক্লাশের ছাত্র বরকতউল্লাহ গতকাল পর্যন্ত বিশেষ ট্রাইবুনালে সর্বকনিষ্ঠ সাক্ষীরূপে উপস্থিত হন। বরকতউল্লাহই একমাত্র সাক্ষী যাহাকে বিবাদীপক্ষ গতকাল জেরা করেন নাই ।

ট্রাইবুনাল কক্ষে

৩০ নভেম্বর, ১৯৬৮

গতকাল শুক্রবারই প্রথম একজন সিএসপি অফিসার বিশেষ ট্রাইবুনালে রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্যদের মামলায় সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। এই উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী হইতেছেন প্রাদেশিক সরকারের লেবার ডাইরেক্টর জনাব সিদ্দিকুর রহমান সিএসপি।

তিনি যে অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত বলিয়া কথিত একটি পত্র সম্পর্কে সাক্ষ্যদান করিয়াছেন, তিনিও একজন সিএসপি অফিসার। সংশ্লিষ্ট অভিযুক্ত ব্যক্তি হইতেছেন সিনিয়র সিএসপি শামসুর রহমান ।

ট্রাইবুনালের অধিবেশন শেষ হইবার পর মুহূর্তে (বিচারপতিগণ কক্ষ ত্যাগ করিয়াছেন)। অভিযুক্তদের কাঠগড়ার নিকট একটি অপ্রীতিকর ঘটনার অভিযোগ শোনা যায়। জনৈক অভিযুক্ত ব্যক্তির সাথে কাঠগড়ার পাশে একজন সুবেদার শ্রেণীর পুলিশ কর্মচারীর বাকবিতণ্ডা হয় বলিয়া প্রকাশ এবং এই তর্কবিতর্কের সময় শেখ মুজিবুর রহমান নিকটে আসিয়া তাহাদের শান্ত করেন।

গতকাল ট্রাইবুনালে মাত্র ২ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। তাহাদের মধ্যে একজনের সাক্ষ্য গ্রহণ অসমাপ্ত থাকে। ইতিপূর্বে কোন অধিবেশনে এত কমসংখ্যক সাক্ষীর (রাজসাক্ষী ছাড়া) সাক্ষ্য গ্রহণ হয় নাই।

এ যাবৎ দুইশত পাঁচজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে। যতদূর জানা যায়, বাদীপক্ষের সাক্ষীদের সংখ্যা এখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। গতকাল বাদীপক্ষের কৌসুলি জনাব টি এইচ খান কোর্টের নিকট অবশিষ্ট সাক্ষীদের নামের একটি তালিকা প্রদান করিয়াছেন। সম্ভবত ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ শেষ হইবার পূর্বেই এই মামলার সকল সরকারী সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্ত হইয়া যাইবে। কৌসুলিদের অনেকে মনে করেন যে, জানুয়ারি মাসে মামলার শেষ পর্যায় সওয়াল-জবাব শুরু হইবে।

অভিযুক্তদের সাথে অধিবেশন শেষে তাঁহাদের স্ত্রীদের কাঠগড়ার নিকট গতকাল সাক্ষাতের নির্দিষ্ট দিন ছিল। সেই কারণে মহিলা দর্শকদের গ্যালারীতে গতকাল অধিক ভিড় পরিলক্ষিত হয়।

প্রায় পক্ষকাল পর গতকাল বেগম মুজিবুর রহমান শেখ সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সম্প্রতি তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ কন্যার বিবাহের পর বেগম মুজিব ট্রাইবুনাল কক্ষে এই দ্বিতীয়বার স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান ।

ট্রাইবুনাল কক্ষে

৩ ডিসেম্বর, ১৯৬৮

রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্যদের মামলার এগারজন রাজসাক্ষীই বর্তমানে ঢাকায় রহিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন কিছুদিন পূর্বে ঢাকার বাহিরে গিয়াছিলেন। গত ২৮শে নভেম্বর তারিখে বিবাদী পক্ষের প্রধান কৌসুলি

জনাব সালাম খান রাজসাক্ষীগণ কোথায় রহিয়াছেন, তাহা জানিতে চাহেন। বাদীপক্ষের কৌসুলি জনাব টি.এইচ. খান কোর্টকে জানান যে, এস.এম. রমিজ তাঁহার অসুস্থ ছেলেকে এবং ডাক্তার সাইদুর রহমান তাহার অসুস্থ স্ত্রীকে দেখিতে গিয়াছেন। লেঃ মোজাম্মেলকে করাচীতে বদলি করা, হইয়াছিল বলিয়াও তিনি জানান। ২৯শে নভেম্বর জনাব খান কোর্টকে পুনরায় বলেন যে, এস এম রমিজ ও ডাক্তার রহমান উক্ত দিবস ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিবেন ।

গতকাল সোমবার কৌসুলি টি এইচ খান ট্রাইবুনালকে জানান যে, সকল রাজসাক্ষীই বর্তমানে ঢাকায় অবস্থান করিতেছেন। যাঁহারা বাহিরে গিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন ।

ঢাকার এডিসি জনাব জি.এম. কাদরী গতকাল ট্রাইবুনালে একমাত্র সাক্ষী ছিলেন। বিবাদীপক্ষের কৌসুলিগণ গতকাল অধিবেশনের সর্বক্ষণ প্রায় চারি ঘণ্টাকাল জেরা করেন। গত শনিবার তিনি জবানবন্দী দান করিয়াছিলেন। অধিকাংশ রাজসাক্ষী এবং কিছুসংখ্যক সাক্ষীর বিবৃতি তিনি গ্রহণ করেন।

গতকাল ছিল অভিযুক্তদের সাথে সাক্ষাতের দিন। অন্যান্য দিনের ন্যায় অভিযুক্তদের স্ত্রীগণ অধিবেশন শেষ হইবার পর কাঠগড়ার নিকট স্ব-স্ব স্বামীর সাথে সাক্ষাৎ করেন । গত প্রায় তিন সপ্তাহ যাবৎ বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব মঞ্জুর কাদের নিয়মিত ট্রাইবুনালে উপস্থিত থাকিতে পারিতেছেন না। তাঁহাকে অবশ্য কোন কোন দিন নিজের চেম্বারে ট্রাইবুনালের মামলা সম্পর্কে ব্যস্ত থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু জনাব কাদের গত কিছুদিন যাবৎ ঢাকা হাইকোর্টে একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলার কাজে নিয়োজিত রহিয়াছেন।

ট্রাইবুনাল কক্ষে

৪ ডিসেম্বর, ১৯৬৮

অভিযুক্তদের অনেকের চেহারায় বাহ্যিক পরিবর্তন হইয়াছে। এই জাতীয় পরিবর্তন যে কোন ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে নাই তাহা নহে ।

অভিযুক্ত স্টুয়ার্ড মুজিবের মামলার প্রথম হইতেই দাড়ি ছিল কি ছিল না সেই সম্পর্কে অনেকেই এখন ভুল করিতেছেন। এমনকি যে সমস্ত সাংবাদিক ও কৌসুলিদের প্রত্যহ ট্রাইবুনালে উপস্থিত থাকিতে হয়, তাঁহাদেরও অনেকে এই ব্যাপারে সঠিকভাবে কিছু বলিতে সক্ষম নহেন।

ইতিমধ্যে জনৈক সরকারী সাক্ষীকে কাঠগড়া হইতে স্টুয়ার্ড মুজিবকে সনাক্ত করিতে বলা হয়। উক্ত সাক্ষী তাঁহাকে সনাক্ত করিতে ব্যর্থ হইলে সরকার পক্ষের কৌসুলি জনাব টি এইচ খান মন্তব্য করেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি ইতিমধ্যে দাড়ি রাখিয়াছেন ।

কয়েকদিন পর অপর একজন সাক্ষী স্টুয়ার্ড মুজিবকে সনাক্ত করিতে অসমর্থ হন। সরকারী কৌসুলি জনাব টি.এইচ. খান এইবার বিপরীত মন্তব্য করেন। তিনি বলেন যে, অভিযুক্ত স্টুয়ার্ড মুজিব দাড়ি কাটিয়া ফেলিয়াছেন। (কয়েকদিন পূর্বে স্টুয়ার্ড মুজিবের দাড়ি থাকিলেও এইবার তিনি দাড়ি কাটিয়াছিলেন ।)

অপর একজন দীর্ঘাঙ্গী অভিযুক্ত ব্যক্তির মুখে চওড়া গোঁফ ছিল। একদিন জনৈক সাক্ষী তাঁহাকে শেখ মুজিবুর রহমান বলিয়া ভুল সনাক্ত করিয়াছিলেন। গত কিছুদিন যাবৎ তাঁর সেই গোঁফ দেখা যাইতেছে না ।

ট্রাইবুনাল কক্ষের সম্মুখস্থ প্রশস্ত বারান্দাটি লবী ও চা-খানা হিসাবে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। বামদিকে ছোট্ট একটি চা কাউন্টার। রমজান মাস আসিবার পূর্বে সাধারণত বিরতির সময় চা কাউন্টারে স্বল্পক্ষণের জন্য ব্যাপক ভিড় হইত। বিশ মিনিটের বিরতির সময় দর্শক, কৌসুলি, সাংবাদিক ও ডিউটিরত সরকারী কর্মচারিগণ ব্যস্ততার মধ্যে এক কাপ চা পান করিবার জন্য সেখানে জমায়েত হইতেন। বেলা এগারোটার সময় বিরতি আরম্ভ হইলেই সকলে ছুটিয়া আসিতেন চা-খানায় । রমজান মাস শুরু হইবার পর হইতে সেই চা-খানাটি প্রায় খদ্দেরশূন্য হইয়া পড়িয়াছে।

বৃদ্ধ দোকানীকে জনৈক দর্শক জিজ্ঞাসা করেন, ‘আপনার কোন খদ্দের নাই বলিলেই চলে। তবুও কেন দোকান খুলিয়া রাখিতেছেন ?

দোকানী : চা-খানা খুলিবার অনুমতি পাইয়াছি—এখনও বন্ধ করিবার নির্দেশ পাই নাই ।

ট্রাইবুনাল কক্ষে

৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৮

সম্ভবত আগামী তেরই ডিসেম্বরের মধ্যে রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্যদের মামলায় সকল সাক্ষীর সাক্ষ্যদান সমাপ্ত হইয়া যাইবে। এ যাবৎ দুই শতাধিক সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণের পর বর্তমানে তদন্তকারী অফিসারদের

সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইতেছে। সংশ্লিষ্ট কৌসুলিগণ মনে করেন যে, যদি ১৩ তারিখের মধ্যে সকল সাক্ষ্য সমাপ্ত হইয়া যায় তবে ২রা জানুয়ারি হইতে সওয়াল-জবাব শুরু হইবে ।

জনৈক প্রবীণ কৌসুলি ধারণা করেন যে, আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে এই মামলা সমাপ্ত হইয়া যাইতে পারে।

চলতি মামলার কাজে ব্যস্ত যে সকল কৌসুলি রহিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে দুইজনকে প্রত্যহই ট্রাইবুনালে উপস্থিত থাকিতে দেখা যায় । আর অন্যান্য সকলে কোন না কোনদিন অন্য কাজের চাপে ট্রাইবুনালে উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই ।

উক্ত দুইজন কৌসুলি হইতেছেন তরুণ ব্যারিস্টার কে জেড আলম ও প্রবীণ কৌসুলি জনাব আবদুল্লাহ । জনাব আলম বিবাদী পক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব সালাম খানকে বিভিন্ন তথ্য দিয়া সাহায্য করিতেই সর্বদা ব্যস্ত থাকেন।

জনাব আবদুল্লাহ জনৈক অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্থন করেন। তিনি প্রাদেশিক পুলিশের সাবেক ডিআইজি। জনাব আবদুল্লাহ অতি সাধারণ জীবনযাপন করেন। চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণের পর তিনি ঢাকা হাইকোর্টে আইনজীবী হিসাবে যোগদান করিয়াছেন। এই বয়সেও তিনি ঢাকা হইতে সাইকেলে চড়িয়া প্রত্যহ কুর্মিটোলায় বিশেষ ট্রাইবুনালে যাতায়াত করিয়া থাকেন ।

ট্রাইবুনাল কক্ষে

৬ ডিসেম্বর, ১৯৬৮

প্রবীণ কৌসুলি খান বাহাদুর নাজিরুদ্দিন কানে কম শুনেন বলিয়া অনেক ক্ষেত্রে তাঁহাকে মামলা পরিচালনার ব্যাপারে অসুবিধার মধ্যে পড়িতে যে হয় না, তাহা নহে। সাক্ষীকে জেরা করিবার সময় তাঁহাকে সাক্ষীর কাঠগড়ার নিকট যাইতে হয়। উচ্চৈস্বরে উত্তর না দিলে তিনি তাঁহার প্রশ্নের উত্তর বুঝিতে প্রায় ক্ষেত্রেই অসমর্থ হন। বিচারপতি রহমান তাঁহার সাথে মাঝে মাঝে এত জোরে কথা বলেন যে, কক্ষের বাহির হইতেও কণ্ঠ শোনা যায় ।

গতকাল ট্রাইবুনালের সম্মুখে শেষ সাক্ষী উপস্থিত হন তদন্তকারী অফিসার জনাব সিরাজুল ইসলাম । সাক্ষী তাঁহার সংক্ষিপ্ত জবানবন্দী দানের পর তাঁহাকে জেরা করার পালা আসে।

বিবাদীপক্ষের কৌসুলি জনাব নাজিরুদ্দিন উক্ত সাক্ষীকে জেরা করিতে চাহেন কিনা, সেই সম্পর্কে বিচারপতি রহমান জানিতে চাহেন । কিন্তু কৌসুলি বলেন যে, আমি সাক্ষীর কোন কথাই শুনিতে পারি নাই ।

বিচারপতি রহমান : কেহ আপনাকে সাহায্যও করিতে পারিবে না এই ব্যাপারে।
বিচারপতি মখসুমুল হাকিম : অত্যন্ত দুঃখিত ।

বিশেষ ট্রাইবুনালের অধিবেশনের সময় জনৈক সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণকালে একপর্যায়ে মামলা সংক্রান্ত একটি দলিল অকস্মাৎ উধাও হইয়া যাওয়ায় মামলার কাজ প্রায় বার মিনিটকাল ব্যাহত হয় ।

উক্ত দলিলটির প্রয়োজন হইলে হঠাৎ সন্ধান শুরু হইয়া যায়। বাদী ও বিবাদী পক্ষের কৌসুলিগণ, সহকারী রেজিস্ট্রার এমনকি বিচারপতিগণও দলিলটির সন্ধানে ব্যস্ত হইয়া পড়েন । এই ব্যাপারটি লইয়া সকলেই যখন ব্যস্ত, সেই সময় সাক্ষীর কাঠগড়ার অনতিদূরে যিনি নির্বিকারভাবে বসিয়াছিলেন, তিনি হইতেছেন রেজিস্ট্রার জনাব মীর্জা। তিনি প্রায় পঁচিশ দিন অনুপস্থিত থাকিবার পর গতকাল কোর্টে আসিয়াছিলেন । এই হারানো দলিলটির ঘটনা লইয়া কিছুটা উত্তেজনারও সৃষ্টি হয়। সেই সময় খোঁজ করিতে করিতে রেজিস্ট্রারের দলিল রাখিবার বাক্স হইতে উক্ত দলিলটির সন্ধান মিলে। সাথে সাথে কক্ষের উত্তেজনাও প্রশমিত হইয়া যায় ।

পরিশিষ্ট-১

মামলার সরকারী ভাষ্য :

রাষ্ট্র বনাম

শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য

১৯৬৮ সালের সংশোধিত ফৌজদারি আইন অধ্যাদেশের ইউ/এস-৫ ধারামতে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে এই মামলার ভাষ্য আদালতে উপস্থাপন করা হলো ।

যথাযথ সম্মানের সঙ্গে উপস্থাপন করা যাচ্ছে যে :

১. গোপনসূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের অনুসরণে এমন একটি ষড়যন্ত্র উদ্ঘাটন করা হয় যার মাধ্যমে ভারত কর্তৃক প্রদত্ত অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও অর্থ ব্যবহার করে পাকিস্তানের একাংশে সামরিক বিদ্রোহের দ্বারা ভারতের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত একটি স্বাধীন সরকার গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়। এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত থাকার দায়ে ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কতিপয় ব্যক্তিকে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা আইনের আওতায় এবং কতিপয় ব্যক্তিকে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে চাকরির সঙ্গে সম্পৃক্ত আইনের আওতায় গ্রেফতার করা হয় ।

২. ঐ সকল ব্যক্তিদের কয়েকজনের নিকট থেকে উদ্ধারকৃত তথ্য-প্রমাণাদিতে দেখা যায় যে, তারা ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির এবং কিছু নির্দিষ্ট অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের ছদ্মনাম ব্যবহার করছে এবং একটি 'ডি ডে'-তে করণীয় কার্যাদি সম্পর্কে ও অন্যান্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তারা অনুরূপ ছদ্ম শব্দাবলী ব্যবহার করছে।

৩. তাদের প্রধান কর্মপরিকল্পনা ছিল সামরিক ইউনিটগুলোর অস্ত্রশস্ত্র দখল করে তাদেরকে অচল করে দেয়া। কমান্ডো স্টাইলে অভিযান চালিয়ে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে তারা অগ্রসর হয় :

ক. সামরিক বাহিনী থেকে আসা লোকদের এবং প্রাক্তন সৈনিক ও বেসামরিক চাকরিজীবীদের তালিকা প্রণয়ন করা, যারা কার্যকরভাবে একটি অগ্রবাহিনীর ভূমিকা পালন করে প্রচলিত ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিতে পারে।

খ. ভারত থেকে প্রাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ ছাড়াও স্থানীয় উৎসসমূহ থেকে প্রাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ নিরাপদে রাখা।

গ. মিথ্যা প্রচারণার সাহায্যে সর্বসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক আনুগত্যহীনতা সৃষ্টি করা। এবং

ঘ. জোরপূর্ব সামরিক কৌশলগত স্থানসমূহ দখল করার উদ্দেশ্যে 'ডি ডে'-এর মত একটি সুযোগের মুহূর্ত নির্ধারণ করা ।

৪. এই ষড়যন্ত্র কার্যকর করার জন্য একটি সভার আয়োজন করা হয়। সেই সভায় পাকিস্তানের যারা ঐ অভিযান কার্যকরী করার দায়িত্বে ছিলেন তাদের প্রতিনিধিরা এবং ভারতীয় পক্ষের যারা অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে এই ষড়যন্ত্রকে সহায়তা করার উদ্যোগ নিয়েছিল তাদের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। ১৯৬৭ সালের ১২ই জুলাই ভারতের আগরতলায় এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

৫. এই ষড়যন্ত্র এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে আরও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী এবং বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো নিচের অধ্যায়সমূহে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে, যখন অভিযুক্ত ষড়যন্ত্রকারীদের কোনো সভার বর্ণনা দেয়া হয়েছে তখন ষড়যন্ত্রের সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহের পুনরাবৃত্তি পরিহার করা হয়েছে। যদিও তারা তাদের প্রায় প্রতিটি সভায়ই ঐ বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতো। এই অভিযোগনামার সঙ্গে পাঁচটি তালিকা সংযুক্ত করা হয়েছে। এগুলোর শিরোনাম যথাক্রমে—‘তালিকা—এ’, ‘অভিযুক্তদের তালিকা’, ‘সাক্ষীর তালিকা’, ‘তথ্য-প্রমাণের তালিকা' ও ‘জিনিসপত্রের তালিকা - সংযোজনী-১ এ এগুলো ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সংযোজনী-২ এ অভিযুক্তদের ছদ্মনাম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কোনো একজন অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম যখন প্রথমবার উল্লেখ করা হয়েছে তখনই তার সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে বলা হয়েছে এবং পরবর্তীতে যখন ঐ নামটি পুনরায় ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়েছে তখন শুধুমাত্র যাতে ঐ নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বুঝায় সে রকমভাবেই তা উল্লেখ করা হয়েছে। উপরোক্ত তালিকাসমূহের যে- কোনোটির অন্তর্ভুক্ত কোনো ব্যক্তির সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদান করার বেলায় ঐ ব্যক্তি যে তালিকার অন্তর্ভুক্ত সেই তালিকার নাম এবং ঐ তালিকার কত নম্বর ক্রমিকে তার অবস্থান সেই নম্বরটি উল্লেখ করা হয়েছে। একইভাবে, যখন প্রথমবারের মত কোনো স্থানের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তখন ঐ স্থানের অবস্থান প্রভৃতি বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে এবং পরে যখন আবার ঐ স্থানটির নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন

পড়েছে তখন অন্যান্য স্থান থেকে ঐ স্থানটিকে আলাদা করে বুঝানোর জন্য যেটুকু উল্লেখ করা দরকার তা-ই করা হয়েছে।

৬. ১৯৬৪ সালের ১৫ থেকে ২১ সেপ্টেম্বর এই মামলার ১ নম্বর আসামী শেখ মুজিবুর রহমান করাচী সফর করছিলেন। এই সফরকালে তিনি পাকিস্তান নৌবাহিনীর লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেন (বর্তমান লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন), আসামী নম্বর-২ কর্তৃক আহূত একটি সভায় যোগদানের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। এই লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন ১৯৬৪ সালের শুরুতে তার নিজ বাসভবন —বাংলো নং- ডি/৭৭, কে.ডি.এ. স্কীম নং ১, করাচীতে অনুষ্ঠিত একটি সভায় এই অভিযোগনামার ৩নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, ৪নং আসামী প্রাক্তন বিশিষ্ট নাবিক সুলতান উদ্দিন আহমদ, ৫নং আসামী বিশিষ্ট নাবিক নূর মোহাম্মদ এবং ১নং সাক্ষী লেফটেন্যান্ট মোজাম্মেল হোসেনের সঙ্গে একমত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য একটি বিপ্লবী সংগঠন সংগঠিত করার বিষয়ে তারা শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনা করবেন। শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে তাদের এই সভা অনুষ্ঠিত হয় এই মামলার ২ নং সাক্ষী মিঃ কামাল উদ্দিন আহমদের বাসায়, যার ঠিকানা—৩/৪৮, এম.এস.পি.পি. স্কুল টিচারস কো-অপারেটিভ সোসাইটি (মালামা আবাদ নামে বহুল পরিচিত), করাচী। এই সভায় নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন:

১. শেখ মুজিবুর রহমান, আসামী নং-১

২. মোয়াজ্জেম, আসামী নং-২

৩. স্টুয়ার্ড মুজিব, আসামী নং-৩

৪. সুলতান, আসামী নং-৪

৫. নূর মোহাম্মদ, আসামী নং-৫

৬. মিঃ আহমদ ফজলুর রহমান, সি.এস.পি, আসামী নং-৬ এবং

৭. মোজাম্মেল, সাক্ষী নং-১ ।

এই সভায় ২ নং আসামী মোয়াজ্জেম বলেছেন যে, নৌ-বাহিনীতে অবস্থানরত পূর্ব পাকিস্তানীরা পূর্ব পাকিস্তানকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার

লক্ষ্যে একটি জঙ্গী বাহিনী সংগঠিত করেছে এবং সেনাবাহিনী ও বিমান বাহিনীর পূর্ব পাকিস্তানী কর্মকর্তারাও এই বাহিনীতে যোগদান করবেন। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন যে, এই পরিকল্পনা সফল করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং সিভিল সার্ভিসে কর্মরত কর্মকর্তাদের সমর্থন ও সহযোগিতা অত্যাবশ্যক। তিনি আরও ব্যাখ্যা করে বলেন যে, ঐ বাহিনীকে পরিচালনা করার জন্য তহবিল দরকার। ১ নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমান এর সঙ্গে শুধুমাত্র একমতই পোষণ করেন নি, উপরন্তু তিনি বলেছেন যে, তার নিজের ধারণা এবং পরিকল্পনাও এরকমই। তিনি ঐ পরিকল্পনার প্রতি তার পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা করেন এবং প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ করে দেবার আশ্বাস প্রদান করেন। ৬ নং আসামী এ.এফ. রহমান যখন ২ নং আসামী মোয়াজ্জেমের সঙ্গে এ বিষয়ে একমত হন যে, পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে যে বঞ্চনা ও বৈষম্য বিদ্যমান তার বিরুদ্ধে একমাত্র জবাব হচ্ছে সামরিক বিদ্রোহ। তখন তিনি একথাও উল্লেখ করেন যে, এ ধরনের সামরিক বিদ্রোহ সংঘটিত হলে ভারতের কি প্রতিক্রিয়া হবে তা তিনি বলতে পারেন না। এই পর্যায়ে ১ নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, এ বিষয়টি তিনি (শেখ মুজিবুর রহমান) দেখবেন। তিনি আরও বলেন যে, তারা যেন পরিকল্পনাটি কিছুদিনের জন্য ধীর গতিতে পরিচালনা করেন। কারণ, যদি আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিরোধীদলীয় প্রার্থী জয়লাভ করতে পারে তাহলে এ ধরনের কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজন না-ও হতে পারে ।

৭. ১ নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর পুনরায় করাচী সফর করেন এবং ১৯৬৫ সালের ১৫ থেকে ২১ জানুয়ারি সেখানে অবস্থান করেন। ঐ সময়কালের মধ্যে একদিন ২ নং আসামী মোয়াজ্জেমের পূর্বোক্ত বাসভবনে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন :

১. শেখ মুজিবুর রহমান, আসামী নং-১

২. মোয়াজ্জেম, আসামী নং-২

৩. নূর মোহাম্মদ, আসামী নং-৫

৪. এ.এফ. রহমান, আসামী নং-৬

৫. ফ্লাইট সার্জেন্ট মাহফিজউল্লাহ, আসামী নং-৭ এবং

৬. লেফটেন্যান্ট মোজাম্মেল হোসেন, সাক্ষী নং-১ ।

এছাড়া আরও কয়েকজন উপস্থিতের পরিচয় উদ্ধার করা যায় নি। এই সভায় ১ নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, একমাত্র একটি উপায়েই পূর্ব পাকিস্তানীরা আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে, তা হলো—পশ্চিম পাকিস্তান থেকে তাদের আলাদা হয়ে যাওয়া। তিনি ঐ পরিকল্পনার প্রতি তার পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা করেন ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দেন এবং ২ নং আসামী মোয়াজ্জেমকে তার কার্যক্রমের সদর দপ্তর পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তর করে বিপ্লবী গ্রুপগুলোর তৎপরতা সম্প্রসারিত করতে বলেন।

৮. এই মামলার ৩ নং সাক্ষী, করাচীর কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান অফিসে কর্মরত মিঃ মোহাম্মদ আমীর হোসেন মিয়া ছিলেন মামলার ৩ নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিব, ৪ নং আসামী সুলতান এবং ৮ নং আসামী প্রাক্তন কর্পোরাল আবুল বাশার মোহাম্মদ আবদুস সামাদের ঘনিষ্ঠ পরিচিতজন। ১৯৬৫ সালের জানুয়ারি মাসের কোনো একদিন ৩ নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিব ৩ নং সাক্ষী আমীর হোসেনকে ২ নং আসামী মোয়াজ্জেমের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। এতে ৩ নং সাক্ষী আমীর হোসেন খুবই অভিভূত হন এবং ঐ গ্রুপের কার্যকরী সদস্য হয়ে ওঠেন।

৯. ১৯৬৫ সালের জানুয়ারি থেকে আগস্ট মাসের মধ্যে ২ নং আসামী মোয়াজ্জেমের বাসভবনে বেশ কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে, যে সভাগুলোতে নিম্নোক্ত ব্যক্তিরা সাধারণভাবে উপস্থিত থাকতেন : '

১. মোয়াজ্জেম, আসামী নং-২

২. স্টুয়ার্ড মুজিব, আসামী নং-৩

৩. সুলতান, আসামী নং-৪

৪. নূর মোহাম্মদ, আসামী নং-৫

৫. হাবিলদার দলিল উদ্দীন, আসামী নং-৯ এবং

৬. আমীর হোসেন, সাক্ষী নং-৩ ।

এরা ছিলেন সংগঠনের সক্রিয় সদস্য। এই সভাগুলোতে তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং সাফল্য লাভের জন্য অনুসৃত পদ্ধতিসমূহ নিয়ে আলোচনা হতো।

১০. পূর্ব পাকিস্তানে কাজকর্মের উদ্যোগ নেবার জন্য সংগঠনের কয়েকজন সক্রিয় সদস্যের স্থায়ীভাবে পূর্ব পাকিস্তানে থাকা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। ২ নং আসামী মোয়াজ্জেমের অনুরোধে একে একে ৩ নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিব ও ৪ নং আসামী সুলতান ছুটি নিয়ে ঢাকায় চলে যান। তাদের স্থায়ীভাবে পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তরিত করে দেবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। ১৯৬৫ সালের আগস্ট মাসে ২ নং আসামী মোয়াজ্জেম, ৩ নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিব ও ৪ নং আসামী সুলতানের মাধ্যমে ১ নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে একটি গ্রুপসভার আয়োজন করে । এই সভায় গ্রুপ সদস্যদের করাচী থেকে ঢাকায় আসার জন্য যাতায়াত খরচ বাবদ ৪ নং আসামী সুলতান ৩ নং সাক্ষী আমীর হোসেনের ঠিকানায় একটি রেজিস্টার্ড খামে করে ১৫০০ টাকা এবং টেলিগ্রাফ মানিঅর্ডারযোগে ৫ নং আসামী নূর মোহাম্মদের কাছে ৫০০ টাকা পাঠায় এবং তাদের উভয়কেই ঐ টাকা ২ নং আসামী মোয়াজ্জেমের নিকট পৌছানোর জন্য বলে। এই টাকা যথাসময়ে ২ নং আসামী মোয়াজ্জেমের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছিল।

১১. পূর্বোক্ত সভা ১৯৬৫ সালের ২৯ আগস্ট তারিখে নির্ধারিত ছিল। ২ নং আসামী মোয়াজ্জেম এবং ৩ নং সাক্ষী আমীর হোসেন ঐ সভায় যোগদানের জন্য পি.আই.এ. বিমানযোগে ঢাকার উদ্দেশ্যে করাচী ত্যাগ করেন।

১২. পূর্বোক্ত সভা নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট স্থানে বিকেল ৩ টায় অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন :

১. শেখ মুজিবুর রহমান, আসামী নং-১

২. মোয়াজ্জেম, আসামী নং-২

৩. স্টুয়ার্ড মুজিব, আসামী নং-৩

৪. সুলতান, আসামী নং-৪

৫. রুহুল কুদ্দুস, সি.এস.পি, আসামী নং ১০ এবং

৬. আমীর হোসেন, সাক্ষী নং-৩।

২ নং আসামী মোয়াজ্জেম কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন এবং বলেন যে, ১ নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমানের দক্ষ পরিচালনা ও সহায়তায় তিনি

সেনাবাহিনীর অনেক কর্মকর্তাকে সংগঠনের তালিকাভুক্ত করেছেন যারা পূর্ব পাকিস্তানকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য কাজ করবেন। সভায় উপস্থিত সকলেই কার্যক্রমের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। ২ নং আসামী মোয়াজ্জেম অর্থ, অস্ত্র এবং গোলাবারুদের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। ১ নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমান ভারতের কাছ থেকে যাবতীয় সাহায্য সংগ্রহের আশ্বাস দেন। সাময়িকভাবে তিনি ২ নং আসামী মোয়াজ্জেমকে ১ লাখ রুপী দেবার কথা বলেন যা ৩ নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিব ও ৪ নং আসামী সুলতানের কাছ থেকে কিস্তিতে ২০০০ থেকে ৪০০০ টাকা করে সংগ্রহ করে নিতে বলেন ।

১৩. ১৯৬৫ সালের ১ লা সেপ্টেম্বর ৩ নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিব ১ নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমানের ঢাকাস্থ ধানমন্ডির বাসভবনে গিয়ে তার কাছ থেকে ৭০০ টাকা পান এবং তা মামলার ৩ নং সাক্ষী আমীর হোসেনের নিকট প্রেরণ করেন।

১৪. ১৯৬৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর ৩ নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিব ১ নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমানের ঢাকাস্থ ধানমন্ডির বাড়িতে গিয়ে তার কাছ থেকে ৪০০০ টাকা পান এবং তা মামলার ৩ নং সাক্ষী আমীর হোসেনের নিকট প্রেরণ করেন। আমীর হোসেন আবার ঐ টাকা থেকে ৩০০ টাকা মামলার ৩ ও ৪ নং আসামী যথাক্রমে স্টুয়ার্ড মুজিব ও সুলতানের ব্যক্তিগত খরচের জন্য পাঠান এবং বাকি টাকা ২ নং আসামী মোয়াজ্জেমের নিকট পৌঁছানোর জন্য নিজের কাছে রাখেন।

১৫. ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় যে সমস্ত প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা ছুটিতে কিংবা অস্থায়ী কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানে ছিলেন তারা পশ্চিম পাকিস্তানে তাদের নির্ধারিত কর্মস্থলে যেতে পারছিলেন না। এই অবস্থায় তাদেরকে পূর্ব পাকিস্তানেই কাজে যোগ দিতে বলা হয়। ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ৩ নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিব ও ৪ নং আসামী সুলতান চট্টগ্রাম নৌঘাঁটিতে কাজে যোগদান করেন । উক্ত আসামীদ্বয় চট্টগ্রামে কর্মরত থাকা অবস্থায়ও তাদের ষড়যন্ত্রমূলক সাংগঠনিক কাজকর্ম চালিয়ে যান । ১৬. ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ৬ নং আসামী এ.এফ. রহমানের বাসা—ফ্লাট নং ২১, ইলাকো হাউস, ভিক্টোরিয়া রোড, করাচীতে ষড়যন্ত্রকারী গ্রুপের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে নিম্নোক্ত ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন :

১. মোয়াজ্জেম, আসামী নং-২

২. নূর মোহাম্মদ, আসামী নং-৫

৩. এ.এফ. রহমান, আসামী নং-৬

৪. সামাদ, আসামী নং-৮ এবং

৫. আমীর হোসেন, সাক্ষী নং-৩।

এই সভায় কাজকর্মের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয় এবং ১ নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকার প্রশংসা করা হয়। ৬ নং আসামী এ.এফ. রহমান যুক্তরাজ্য থেকে একটি রেডিও ট্রান্সমিটার সংগ্রহের চেষ্টা করেন। সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, ২ নং আসামী মোয়াজ্জেমকে পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তর করার জন্য চেষ্টা করা হবে। সংগঠনের যাবতীয় কাজের জন্য ঐ সময় ৬ নং আসামী এ. এফ. রহমানের অতিথি হিসাবে অবস্থানরত মামলার ৪ নং সাক্ষী মিঃ কে.জি. আহমদের অফিসটি ব্যবহারের বিষয়টিও সভায় স্থির করা হয়।

১৭. ঐ একই মাসে (ডিসেম্বর, ১৯৬৫) অন্য একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় মামলার ২ নং আসামী মোয়াজ্জেমের বাসা অফিসার্স কোয়ার্টার, কারসায, করাচী এই ঠিকানায়। এই সভায়ও উপস্থিত ছিলেন পূর্বোক্ত ১৬ নং অধ্যায়ে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ। ২ নং আসামী মোয়াজ্জেম ব্যাখ্যা করে বলেন যে, স্টুয়ার্ড মুজিব, ৩ নং আসামী এবং সুলতান, ৪ নং আসামী পূর্ব পাকিস্তানে কাজ করে চলেছেন এবং খুব শীঘ্রই ৮ নং আসামী সামাদ এবং ৩ নং সাক্ষী আমীর হোসেনকে গ্রুপের কাজকর্মের পরিধি বৃদ্ধি করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো হবে। ২ নং আসামী মোয়াজ্জেম আরও বলেন যে, গ্রুপের কাজের সাফল্যের জন্য ৩০০০ স্বেচ্ছাসেবী সংগ্রহ করা দরকার এবং তাদের সবাইকে অস্ত্র সজ্জিত করে যদি প্রতিরক্ষা বিভাগে কর্মরত কয়েকজন অফিসার দ্বারা পরিচালনা করা যায় তাহলে অবিলম্বে তারা পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক কর্মকর্তাদেরকে বিতাড়িত করতে পারবেন। পূর্বোক্ত ১৬ নং অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয়গুলোও এই সভায় আলোচনা করা হয় । ১৮. একই মাসে (ডিসেম্বর, ১৯৬৫) ৭ নং আসামী মাহফিজ উল্লাহর আহ্বানে তার বাসা ৩২৯/২, কোরাঙ্গী ক্রীক, করাচীতে আরেকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় নিম্নোক্তরা উপস্থিত ছিলেন :

১. সুলতান, আসামী নং-৪

২. মাহফিজ উল্লাহ, আসামী নং- ৭

৩. ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মুহাম্মদ ফজলুল হক, আসামী নং-১১

৪. ওয়ারেন্ট অফিসার মুশারফ এইচ. শেখ, সাক্ষী নং-৫

৫. সার্জেন্ট শামসুদ্দিন আহমেদ, সাক্ষী নং-৬ এবং আরও কয়েকজন যাদেরকে চিহ্নিত করা যায় নি ।

এই সভায় ৭ নং আসামী মাহফিজ উল্লাহ এবং ৪ নং আসামী সুলতান বারবার বলছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় হচ্ছে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ঐ অঞ্চলকে আলাদা করে ফেলা এবং একটি সফল সামরিক বিদ্রোহ ছাড়া তা কিছুতেই সম্ভব নয়। সভায় ২ নং আসামী মোয়াজ্জেমের নেতৃত্বে কাজকর্মের অগ্রগতির পর্যালোচনা করে সন্তোষ প্রকাশ করা হয় ।

১৯. ১৯৬৬ সালের ২ ফেব্রুয়ারি ৩ নং সাক্ষী আমীর হোসেনের করাচী থেকে বিদায় উপলক্ষে ২ নং আসামী মোয়াজ্জেম তাকে তিনটি টেবিল ডায়রি প্রদান করেন। ঐ ডায়রিগুলোর কয়েকটি পৃষ্ঠায় তিনি আমীর হোসেনকে পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে তার কিছু নির্দেশাবলী এবং সব সময় মনে রাখার মত কিছু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কথা লিখে দিয়েছিলেন। ২ নং আসামী মোয়াজ্জেম তাকে বলেছিলেন যে, ঐ কথাগুলো তিনি তার নোট বুক থেকে ওখানে লিখে দিয়েছেন। এই নোট বুকটি যে ডায়রিগুলো দেখে আসামীদের ছদ্মনামগুলো সংযোজনী-২ এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যেই পাওয়া যেতে পারে। তিনি ১ নং আসামী, শেখ মুজিবুর রহমানের চাহিদা অনুযায়ী তাকে পৌছে দেবার জন্য তার কাছে (আমীর হোসেনের কাছে) একটি মানচিত্র এবং অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের দু'টি তালিকাও প্রদান করেন।

২নং আসামী মোয়াজ্জেম ৩ নং সাক্ষী আমীর হোসেনকে কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব নিতে বলেন এবং গ্রুপ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করার অধিকার প্রদান করেন। তিনি তাকে আরও বলেন যে, সংগৃহীত অর্থ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় খরচ চালিয়ে বাকি অর্থ যেন ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে করাচীতে তার কাছে পাঠানো হয়।

২০. ৩ নং সাক্ষী আমীর হোসেন ঢাকায় পৌঁছে চট্টগ্রামে যান গ্রুপের কাজকর্মের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে। সেখানে ৩ নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিব এবং ৪ নং আসামী সুলতান বিদ্রোহ সংঘটনে তাদের নির্ধারিত কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ১৯৬৬ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি তিনি (৩ নং সাক্ষী আমীর হোসেন) চট্টগ্রামস্থ মিসকা হোটেলে তার কক্ষে একটি সভা আহ্বান করেন যেখানে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন :

১. স্টুয়ার্ড মুজিব, আসামী নং-৩

২. সুলতান, আসামী নং-৪

৩. মিঃ ভূপতিভূষণ চৌধুরী (মানিক চৌধুরী নামে খ্যাত), আসামী নং-১২

৪. মিঃ বিধান কৃষ্ণ সেন, আসামী নং-১৩

৫. সুবেদার আবদুর রাজ্জাক, ই.পি. আর, আসামী নং-১৪

৬. ডঃ সাইদুর রহমান চৌধুরী, সাক্ষী নং-৭ এবং

৭. প্রাক্তন লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মুহাম্মদ শহীদুল হক (পি. এন. ভি. আর), সাক্ষী নং-৮।

১২ নং আসামী মানিক চৌধুরী এবং ৭ নং সাক্ষী সাইদুর রহমান সেখানে ৩ নং সাক্ষী আমীর হোসেনকে বলেন যে, ১ নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমান গ্রুপের প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন দেবার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। তারা এই গ্রুপের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত ছিলেন। ১২ নং আসামী মানিক চৌধুরী গ্রুপের কাজে সহায়তার জন্য ৩ নং সাক্ষী আমীর হোসেনের কাছে ৩০০০ টাকা প্রদান করেন ।

২১. ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পূর্ব পাকিস্তানের গ্রুপের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে ২ নং আসামী মোয়াজ্জেম ৮ নং আসামী সামাদকে ঢাকায় পাঠান। তাকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয়ায় তার জীবনধারণের জন্য ঢাকায় আসা তার ছিল একান্তই প্রয়োজন। ২ নং আসামী মোয়াজ্জেম একই সঙ্গে ৩ নং সাক্ষী আমীর হোসেনের কাছে এই মর্মে একটি চিঠি লিখে দেন যে, যতদিন তার (৮নং আসামী সামাদের) কোন চাকরির ব্যবস্থা না হয় ততদিন যেন তিনি তাকে মাসে ৩০০ টাকা করে প্রদান করেন। ১৯৬৬ সালের

২২ ফেব্রুয়ারি লেখা এই চিঠিতে ২ নং আসামী মোয়াজ্জেম আরও উল্লেখ করেন যে, তিনি সবকিছুই পরশের সঙ্গে (পরশ ১ নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমানের ছদ্মনাম) আলোচনা করেছেন এবং ভয় করার কোনো কিছু নেই ।

২২. একই মাসে ৮ নং আসামী সামাদ চারজন নতুন সদস্য সংগ্রহ করেন। এরা হচ্ছেন :

১. মুজিবুর রহমান, কেরানী, ই.পি.আর.পি.সি. আসামী নং-১৫

২. প্রাক্তন ফ্লাইট সার্জেন্ট মুহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক, আসামী নং-২৬

৩. প্রাক্তন নায়েক সুবেদার আশরাফ আলী খান, আসামী নং-৯ এবং

৪. প্রাক্তন লেন্স নায়েক এ.বি.এম. ইউসুফ, সাক্ষী নং-১০।

এই নতুন সদস্যদেরকে গ্রুপের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে দীক্ষিত করেন৩ নং সাক্ষী আমীর হোসেন।

২৩. ১৯৬৬ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি ১ নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমান চট্টগ্রাম সফর করেন এবং লালদীঘি ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় ভাষণ দেন। এই জনসভার পরে তিনি ৭ নং সাক্ষী সাইদুর রহমানের বাসা—১২, রফিক উদ্দিন সিদ্দিকী বাইলেন, এনায়েত বাজার, চট্টগ্রাম ঠিকানায় গ্রুপের একটি সভা ডাকেন। এই সভায় উপস্থিতরা হচ্ছেন :

১. শেখ মুজিবুর রহমান, আসামী নং-১

২. স্টুয়ার্ড মুজিব, আসামী নং-৩

৩. মানিক চৌধুরী, আসামী নং-১২ এবং

৪. সাইদুর রহমান, সাক্ষী নং-৭ ।

এই সভায় ১ নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমান ৭ নং সাক্ষী সাইদুর রহমানকে গ্রুপের সভার জন্য একটি জায়গার ব্যবস্থা করতে বলেন ।

২৪. ঐ একই মাসে (ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬) ১ নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমান গ্রুপের জন্য আর্থিক সহায়তা লাভের আরেকটি উৎস বের করেন। ১১ নং সাক্ষী মুহাম্মদ মোহসিন যিনি ছিলেন ১০ নং আসামী রুহুল কুদ্দুসের খালাত

ভাই, ১ নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমান গ্রুপের সাহায্যে অর্থ প্রদান করার জন্য তাকে বলেন। এইরূপ কথাবার্তার পরে ১১ নং সাক্ষী মোহসিন যখন ১ নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমানের বসার ঘর থেকে বের হয়ে আসছিলেন তখন ৪ নং আসামী সুলতান তাকে বলেন যে, ১ নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে কথা মোতাবেক তিনি যেন 'মুরাদ'-এর (মুরাদ স্টুয়ার্ড মুজিবের ছদ্মনাম) নিকট টাকা দেন। ৩ নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিব ১১ নং সাক্ষী মোহসিনের নিকট থেকে দুই কিস্তিতে ৭০০ টাকা গ্রহণ করেন।

২৫. ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে ২ নং আসামী মোয়াজ্জেমের পরামর্শানুযায়ী ৬ নং আসামী এ.এফ. রহমান তার স্ত্রীর মালিকানাধীন পেট্রল পাম্পে ৮ নং আসামী সামাদকে ম্যানেজার পদে চাকরি প্রদান করেন। এই পেট্রল পাম্পটির অবস্থান ঢাকাস্থ ভারতীয় সহকারী রাষ্ট্রদূতের বাসভবনের কাছে। এই পেট্রল পাম্পের নাম গ্রীনভিউ পেট্রল পাম্প- ষড়যন্ত্রকারী গ্রুপের ব্যবস্থা অনুযায়ী ভারতীয় দূতাবাসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে ৬ নং আসামী এ.এফ. রহমানের মাধ্যমে গ্রুপের সদস্যদের লিয়াজোঁ রাখা হতো। ভারতীয় দূতাবাসের কর্মকর্তারা পেট্রল নেবার অজুহাতে ঐ পাম্পে সব সময় যাতায়াত করতেন । ২৬. ১৯৬৬ সালের ৪ মার্চ ২ নং আসামী মোয়াজ্জেম ৩ নং সাক্ষী আমীর হোসেনের কাছে একটি চিঠি লিখে জানান যে, সে যেন ৪ নং সাক্ষী কে.জি-এর কাছে ঢাকাস্থ অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন সংস্থার কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার কথা বলেন। তিনি চিঠিতে ৩ নং সাক্ষী আমীর হোসেনকে আরও নির্দেশ দেন যে, সে যেন চতুর্দিকে আঙ্গিনাসহ একটি বাড়ি ভাড়া করে রাখে যেখানে ভারত থেকে পাওয়া অস্ত্রশস্ত্র রাখা হবে ।

২৭. একই মাসে (মার্চের প্রথম দিকে, ১৯৬৬) ৩ নং সাক্ষী আমীর হোসেন ঢাকার মহাখালীতে একটি সভা আহ্বান করেন, যেখানে নিম্নোক্ত ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন

১. সামাদ, আসামী নং ৮

২. মুজিব, কেরানী, আসামী নং ১৫

৩. এম.এ.রাজ্জাক, আসামী নং-১৬

৪. সার্জেন্ট জহুরুল হক, আসামী নং-১৭

৫. আশরাফ আলী, সাক্ষী নং-৯ এবং

৬. ইউসুফ, সাক্ষী নং-১০ ।

ঐ সভায় উপস্থিত আরও কতিপয় ব্যক্তির নাম নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে:

১. এল.এ.সি.এম.এ নওয়াজ

২. এল.এ.সি.জেড.এ চৌধুরী এবং

৩. সার্জেন্ট মিয়া, পি.এ.এফ ।

(তদন্ত চলাকালীন সময়ে এই সকল ব্যক্তির পরিচয় উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি)

সভায় এ বিষয়ে খুবই জোর দেয়া হয়েছে যে, তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির একমাত্র পথ হচ্ছে সামরিক বিদ্রোহ। এ বিষয়টিও ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, ভারত সরকার তাদেরকে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করবে।

২৮. ১৯৬৬ সালের ১২ মার্চ ১ নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমান ষড়যন্ত্রকারীদের একটি সভা আহ্বান করেন। দিনটি ছিল শনিবার। ২ নং আসামী মোয়াজ্জেমের জন্য এই দিনটিই সবচেয়ে সুবিধাজনক। কারণ চাকরিস্থল থেকে ছুটি না নিয়েই তিনি সপ্তাহান্তে ঢাকায় গিয়ে সভায় যোগদান করতে পারেন। প্রায় সন্ধ্যা নাগাদ মিঃ তাজউদ্দিনের বাসা নং ৬১৭, রোড নং-১৮, ধানমন্ডি, ঢাকাতে সভা শুরু হয়। মিঃ তাজউদ্দিন ১ নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমানের একজন ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহযোগী। তিনি এই সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভালভাবেই জানতেন। কিন্তু তিনি নিজে এই সভায় উপস্থিত থাকেন নি। এই সভায় অংশগ্রহণকারীদের ১ নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমান একটি বাসস্ট্যান্ড থেকে গাড়িতে তুলে নিয়ে পূর্বোক্ত বাড়িতে যান। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন :

১. শেখ মুজিবুর রহমান, আসামী নং-১

২. মোয়াজ্জেম, আসামী নং-২

৩. স্টুয়ার্ড মুজিব, আসামী নং-৩

৪. রুহুল কুদ্দুস, আসামী নং-১০ এবং

৫. আমীর হোসেন, সাক্ষী নং-৩।

এই সভায় ২ নং আসামী মোয়াজ্জেম আশা প্রকাশ করে বলেন যে, 'ডি' দিবসে পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র জনগণ তাদের সঙ্গে থাকবে। সভায় অংশগ্রহণকারী সকলেই এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন যে, ষড়যন্ত্রকারী গ্রুপের প্রতিটি সদস্য যেদিন অস্ত্রসজ্জিত হবে এবং প্রশিক্ষণ পাবে সেদিনেই চূড়ান্ত সময় উপস্থিত হবে। এই সভায় ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র প্রদান সংক্রান্ত আলোচনা করার জন্য তাদের একটি প্রতিনিধিদল ভারতে পাঠানোর আয়োজন করা হয়।

২৯. এর অল্প কয়েক দিন পরে ৯ নং সাক্ষী আশরাফ আলী পূর্ব পাকিস্তানের একটি সেনানিবাসের একটি স্কেচ ৩ নং আসামী আমীর হোসেনের কাছে প্রদান করেন ।

৩০. ১৯৬৬ সালের ১৯ মার্চ ২ নং আসামী মোয়াজ্জেম চিঠির মারফত ৩ নং সাক্ষী আমীর হোসেনকে জানান যে, সে যেন ৬ নং আসামী এ.এফ. রহমানকে টেলিফোনে জানিয়ে দেয় যে ২ নং আসামী মোয়াজ্জেমের ঢাকায় স্থানান্তরের আয়োজন করা হয়েছে। তিনি ৩ নং সাক্ষী আমীর হোসেনকে আরও জানান যে, ৫ নং আসামী নূর মোহাম্মদ কয়েকদিনের মধ্যেই ঢাকা যাচ্ছে এবং সে তাকে (আমীর হোসেনকে) পশ্চিমাঞ্চলের কাজকর্ম সম্পর্কে খবরাখবর জানাবে। একই চিঠিতে তিনি ছদ্ম ভাষায় লিখেছেন যে, তিনি তার চাকর শফির (আজ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় নি) মাধ্যমে তার (আমীর হোসেনের) কাছে একটি ছোট্ট অস্ত্র পাঠাবে এবং ৩ নং সাক্ষী আমীর হোসেন যেন অস্ত্রশস্ত্র কেনার জন্য আরও বেশি পরিমাণে অর্থের সংস্থানে মনোনিবেশ করে ।

৩১. এর প্রায় এক সপ্তাহ পরে ২ নং আসামী মোয়াজ্জেম, ৩ নং সাক্ষী আমীর হোসেনের নিকট আরেকটি চিঠি লিখে ৬ নং আসামী এ.এফ. রহমানের কাছ থেকে টাকা নিয়ে ব্যাংক ড্রাফট করে তার নিকট পাঠাতে বলেন। যথানির্দেশ, ৩ নং সাক্ষী আমীর হোসেন ৬ নং আসামী এ.এফ. রহমানের কাছ থেকে নগদ ৫,৫০০ টাকা গ্রহণ করেন। এ থেকে ৫০০০ টাকা ১৯৬৬ সালের ৩১ মার্চ ব্যাংক ড্রাফট করে ২ নং আসামী মোয়াজ্জেমের নিকট পাঠান এবং বাকি ৫০০ টাকা আমীর হোসেন তার নিজের কাছে খরচের জন্য রাখেন ।

৩২. ১৯৬৬ সালের ৩ এপ্রিল ৩ নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিব এবং ৩ নং সাক্ষী

আমীর হোসেন ১ নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমানের ঢাকাস্থ ধানমন্ডির বাড়িতে যান এবং ছোট ছোট অস্ত্র ক্রয়ের জন্য আরও টাকার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। ৩ নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিব ২ নং আসামী মোয়াজ্জেম কর্তৃক মনোনীত হয়েছিল ১ নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট থেকে গ্রুপের জন্য অর্থ সংগ্রহের কাজে। ১ নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমান তখন ৩ নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিবের নিকট নগদ ৪,০০০ টাকা প্রদান করেন এবং ৩ নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিব আবার ঐ টাকা ৩ নং সাক্ষী আমীর হোসেনের কাছে প্রদান করেন ।

৩৩. এর পরের দিন ৩ নং সাক্ষী আমীর হোসেন ২ নং আসামী মোয়াজ্জেমের কাছ থেকে একটি চিঠি পান যাতে ছদ্ম ভাষায় আরও বেশি পরিমাণ টাকার জরুরী প্রয়োজনের কথা লেখা ছিল। ফলে ৩ নং সাক্ষী আমীর হোসেন ৩ নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিবকে ১০ নং আসামী রুহুল কুদ্দুসের নিকট পাঠান আরও টাকার জন্য। ৩ নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিব ১০ নং আসামী রুহুল কুদ্দুসের কাছ থেকে ২,০০০ টাকা সংগ্রহ করেন এবং তা ৩ নং সাক্ষী আমীর হোসেনের নিকট প্রদান করেন। অতঃপর ৩ নং সাক্ষী আমীর হোসেন ৩ নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিবকে ৬,০০০ টাকা দিয়ে চট্টগ্রাম পাঠান এবং চট্টগ্রাম থেকে ঐ টাকা ব্যবসায়ীদের জাহাজের মাধ্যমে ২ নং আসামী মোয়াজ্জেমের নিকট পাঠানোর ব্যবস্থা করতে বলেন।

৩৪. প্রায় একই দিনে ৩ নং সাক্ষী আমীর হোসেন গ্রুপের জন্য ১০৭, দীননাথ সেন রোড, ঢাকা এই ঠিকানায় একটি বাড়িভাড়া করেন। এই বাড়িতে যে টেলিফোনের ব্যবস্থা করা হয় তার নম্বর ৮২৪৫২।

৩৫. ১৯৬৬ সালের ৬ এপ্রিল ২ নং আসামী মোয়াজ্জেম ৩ নং সাক্ষী আমীর হোসেনের কাছে একটি চিঠি লেখেন। এই চিঠির সঙ্গে কয়েক দিন আগে তার কাছে ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে পাঠানো টাকার একনলেজমেন্ট রিসিটও ছিল। এই চিঠিতে তিনি ছদ্ম ভাষায় তাদের ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে পরিমাণ অর্থ ও অন্যান্য জিনিসপত্র প্রয়োজন তার কথা লেখেন এবং৩ নং সাক্ষী আমীর হোসেনকে একটি বাজেট তৈরি করতে বলেন । কিন্তু ৩ নং সাক্ষী আমীর হোসেন অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত না থাকার কারণে তিনি স্থির করলেন যে, যতদিন পর্যন্ত ১ নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমান বাজেট না চান ততদিন তিনি কোনো বাজেট করবেন না ।

৩৬. এরপরই ১৯৬৬ সালের ৮ এপ্রিল ৩ নং সাক্ষী আমীর হোসেন ২ নং আসামী মোয়াজ্জেমের নিকট থেকে আরেকটি চিঠি পান যাতে তুষারকে (৬নং আসামী এ.এফ. রহমানের ছদ্মনাম) জানাতে বলেন য, তিনি ১৯৬৬ সালের ২২ এপ্রিল স্থানান্তরিত হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে আসছেন।

৩৭. ঐ একই মাসে (এপ্রিল, ১৯৬৬) ১ নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমান তার ধানমন্ডির বাড়িতে ১২ নং আসামী মানিক চৌধুরীকে ডেকে পাঠান। মানিক চৌধুরী সেখানে গিয়ে দেখেন যে, ৪ নং আসামী সুলতান সেখানে আগেই উপস্থিত হয়েছে। ১ নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমান ১২ নং আসামী মানিক চৌধুরীকে ৪ নং আসামী সুলতানের নিকট টাকা দিতে বলেন। এর তিন/চারদিন পরে ১২ নং আসামী মানিক চৌধুরী ৪১, রামজয় মহাজন লেন, চট্টগ্রাম ঠিকানায় তার বাসায় ৪ নং আসামী সুলতানকে ডেকে পাঠান এবং ষড়যন্ত্রকে সফল করার জন্য তার কাছে ১৫০০ টাকা প্রদান করেন ।

৩৮. একই মাসে (এপ্রিল, ১৯৬৬) ১১ নং সাক্ষী মোহসিনকে ১ নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমান তার ঢাকাস্থ ধানমন্ডির বাসভবনে ডেকে পাঠান এবং অত্যন্ত সতর্কতা ও গোপনীয়তার সঙ্গে বলেন যে, তিনি বর্তমান ও প্রাক্তন সৈনিকদের সহ একটি বিপ্লবী গ্রুপ গঠন করছেন, তিনি যেন তার এ গ্রুপ পরিচালনার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন ।

৩৯. ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসের শেষ কিংবা মে মাসের শুরুর দিকে কোনো এক সময় চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত হবার পর ২ নং আসামী মোয়াজ্জেম ৩ নং সাক্ষী আমীর হোসেনের সঙ্গে ঢাকাস্থ গেন্ডারিয়ার ১০৭, দীননাথ সেন রোডে তার বাসায় দেখা করেন। দু'জনের মধ্যে সেখানে গ্রুপের পক্ষ থেকে টাকা পয়সা সংগ্রহ এবং গ্রুপের কাজকর্মের খরচ সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এতে গ্রুপের নামে যে বিরাট অঙ্কের অর্থ খরচের হিসাব দেখা যায় তাকে ২ নং আসামী মোয়াজ্জেম সঠিক বলে মেনে নিতে পারেন না। ফলে ৩ নং সাক্ষী আমীর হোসেন এবং ২ নং আসামী মোয়াজ্জেমের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। ৩ নং সাক্ষী আমীর হোসেন ২ নং আসামী মোয়াজ্জেমের নেতৃত্বের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেন। ঐ দিন সন্ধ্যায়ই ৩ নং সাক্ষী আমীর হোসেন ডঃ খালেকের বাড়িতে ২ নং আসামী মোয়াজ্জেমের নিকট নগদ ৮,০০০ টাকা, দুটি ক্যাশ বই এবং হিসাবের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য কাগজপত্র হস্তান্তর করেন। ডঃ খালেকের এই বাড়ির ঠিকানা : রোড

নং-২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা এবং এই বাড়িতেই তখন ২ নং আসামী মোয়াজ্জেম অবস্থান করছিলেন। ঐ বাড়িটির নাম 'আলেয়া'। ২ নং আসামী মোয়াজ্জেম তখন ৩ নং সাক্ষী আমীর হোসেনকে তার দীননাথ সেনের বাসা ভাড়া মিটাবার জন্য ১৫০০ টাকা প্রদান করেন। এরপর ৩ নং সাক্ষী আমীর হোসেন এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

৪০. ১৯৬৬ সালের ১০ মে ২ নং আসামী মোয়াজ্জেম চট্টগ্রামের নৌঘাঁটিতে নিয়োগপ্রাপ্ত হন । সেখানে নিয়োগ পাবার পরই তিনি গ্রুপের একটি সভা আহ্বান করেন। এই সভাটি অনুষ্ঠিত হয় ৭ নং সাক্ষী সাইদুর রহমানের 'আউটার হাউস'-এ। সাইদুর রহমান এই বাড়িটি গ্রুপের সভাস্থল হিসেবে ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। এই 'আউটার হাউস' চট্টগ্রামের এনায়েত হোসেন মার্কেট এলাকায় অবস্থিত। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন :

১. মোয়াজ্জেম, আসামী নং-২

২. স্টুয়ার্ড মুজিব, আসামী নং-৩

৩. সুলতান, আসামী নং-৪

৪. মানিক চৌধুরী, আসামী নং-১২

৫. মুহাম্মদ খুরশীদ, আসামী নং-১৮ এবং

৬. সাইদুর রহমান, সাক্ষী নং-৭।

১২নং আসামী মানিক চৌধুরী এবং ৭ নং সাক্ষী সাইদুর রহমান এই সভার কার্যবিবরণীর বহির্ভূত ছিলেন ।

৪১. ১৯৬৬ সালের ৬ মে, ১ নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমান এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এমন কিছু সুনির্দিষ্ট কার্যকলাপের দায়ে পাকিস্তান নিরাপত্তা আইনের অধীনে গ্রেফতার হন। গ্রেফতারের পরই তাকে ডিটেনশন দেয়া হয় এবং এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকার কারণে তাকে জেলে পাঠানো হয়। পাকিস্তান নিরাপত্তা আইনে ডিটেনশন খাটার সময়ও অন্যান্য কতিপয় মামলায় তার বিচার হয় ।

৪২. ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমানের পূর্বোক্ত গ্রেফতার বরণের পরে তিনি যে রাজনৈতিক দলের সদস্য সেই দল তার বাসভবনে ১৯৬৬ সালের ২০

মে একটি জরুরী সভার আয়োজন করে। ১২ নং আসামী মানিক চৌধুরী এই সভায় যোগদান করার জন্য চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা যান । সভায় যোগদান করার পূর্বে ১২ নং আসামী মানিক চৌধুরী ৭ নং সাক্ষী সাইদুর রহমানকে নিয়ে ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারী মিঃ পি.এন. ওঝার অফিসে যান। মিঃ পি.এন. ওঝা সাইদুর রহমানের পরিচয় ইত্যাদি লিখে রাখেন এবং পরে আবার মাঝে মাঝে ওখানে যাবার জন্য বলেন। ৭ নং সাক্ষী সাইদুর রহমান সেখান থেকে বের হয়ে আসার পরও ১২ নং আসামী মানিক চৌধুরী অনেকক্ষণ সেখানে অবস্থান করেন।

৪৩. ১৯৬৬ সালের ২০ ও ২১ মে'র মধ্যবর্তী রাতে ১২ নং আসামী মানিক চৌধুরী এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এমন কতিপয় কার্যকলাপের দায়ে পাকিস্তান নিরাপত্তা আইনে চট্টগ্রামে গ্রেফতার হন ।

৪৪. ঐ একই মাসে (মে, ১৯৬৬) ১২ নং আসামী মানিক চৌধুরীর গ্রেফতারের পর ২ নং আসামী মোয়াজ্জেম পূর্বোক্ত 'আউটার হাউস'-এর ষড়যন্ত্রকারী গ্রুপের আরও দুটি সভা আহ্বান করেন। এই সভা দুটোতে উপস্থিত ছিলেন:

১. মোয়াজ্জেম, আসামী নং-২

২. স্টুয়ার্ড মুজিব, আসামী নং-৩

৩. সুলতান, আসামী নং ৪

৪. খুরশীদ, আসামী নং-১৮ এবং

৫. সাইদুর রহমান, সাক্ষী নং ৭ ।

এই সভাসমূহে গ্রুপের বিভিন্ন সদস্যের কাজ ভাগ করে দেয়া হয় এবং কোন পদ্ধতিতে কাজ করলে সাফল্য নিশ্চিত সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। ঢাকা, কুমিল্লা, যশোর ও চট্টগ্রাম সেনানিবাস এবং চট্টগ্রাম নৌঘাঁটির ম্যাপ মূল্যায়ন করা হয় এবং আরও বেশি অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়া হয়।

৪৫. ঐ একই মাসে (মে, ১৯৬৬) চট্টগ্রামে পি.আই.এ-র জেলা ম্যানেজার ১২ নং সাক্ষী মিঃ এম.এম. রমিজ ২ নং আসামী মোয়াজ্জেমের সংস্পর্শে আসেন এবং ষড়যন্ত্রে যোগ দেন।

৪৬. ১২নং সাক্ষী রমিজের পরই ষড়যন্ত্রকারীদের দলে যোগ দেন ১৯ নং আসামী মিঃ কে.এম. শামসুর রহমান সি.এস.পি। তিনি তখন চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছিলেন।

৪৭. ঐ একই মাসে (মে, ১৯৬৬) ৯ নং সাক্ষী আশরাফ আলী এবং ৮ নং আসামী সামাদ ১০০/৩, আজিমপুর রোড, ঢাকা ঠিকানায় গ্রুপের খরচে 'সিটি' নামে একটি বাড়ি ভাড়া করেন। এরপর ঐ দুই ব্যক্তি তাদের পূর্ববর্তী আবাসস্থল ৩ নং সাক্ষী আমীর হোসেনের বাড়ি থেকে এই নতুন ভাড়া নেয়া বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়।

৪৮. ১৯৬৬ সালের জুন মাসে ২ নং আসামী মোয়াজ্জেম চট্টগ্রামের নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটির তার বাসায় ১২ নং সাক্ষী রমিজকে একটি ডায়রি, একটি নোট বুক এবং একটি ফোল্ডার দিয়ে সেগুলো পড়তে বলেন। এই সমস্ত প্রমাণপত্রে প্রস্তাবিত স্বাধীন রাষ্ট্রের সরকারের রূপ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা ছিল। এতে বলা হয় যে, সকল সম্পত্তি রাষ্ট্রের হাতে নিয়ে নেয়া হবে। শিল্প-কলকারখানা জাতীয়করণ করা হবে এবং মুদ্রার পরিবর্তে কুপন পদ্ধতি চালু করা হবে। ২ নং আসামী মোয়াজ্জেম তাকে নতুন রাষ্ট্রের সবুজ ও গোলাপী রংয়ের পতাকাও দেখিয়েছেন।

৪৯. এরপর ঐ মাসেই (জুন, ১৯৬৬) ২ নং আসামী মোয়াজ্জেম ১২ নং সাক্ষী রমিজের বাসায় পি.আই.এ হাউস-৬০, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম ঠিকানায় একটি সভা আহ্বান করেন। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন :

১. মোয়াজ্জেম, আসামী নং-২

২. স্টুয়ার্ড মুজিব, আসামী নং-৩

৩. খুরশীদ, আসামী নং-৩

৪. রিসালদার শামসুল হক, এ.সি, আসামী নং-২০

৫. হাবিলদার আজিজুল হক, এসএসজি, আসামী নং-২১ এবং

৬. রমিজ, সাক্ষী নং-১২।

এই সভার উদ্দেশ্য ছিল গ্রুপের প্রথম সারির কর্মীদের সঙ্গে রমিজকে পরিচয় করিয়ে দেয়া। উপরে যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তারা ছাড়াও ঐ সভায়

আরও অনেক কর্মী উপস্থিত ছিল। কিন্তু তাদের পরিচয় উদ্ধার করা যায় নি।

৫০. ঐ মাসেরই শেষ দিকে (জুন, ১৯৬৬) ২ নং আসামী মোয়াজ্জেম তার বাসা নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রামে একটি সভা আহ্বান করেন। নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন :

১. মোয়াজ্জেম, আসামী নং ২

২. স্টুয়ার্ড মুজিব, আসামী নং ৩

৩. সুলতান, আসামী নং ৪

৪. সুবেদার রাজ্জাক, আসামী নং ১৪

৫. জহুরুল হক, আসামী নং ১৭

৬. খুরশীদ, আসামী নং ১৮

৭. রিসালদার শামসুল হক, আসামী নং ২০

৮. আশরাফ আলী, সাক্ষী নং ৯ এবং

৯. ইউসুফ, সাক্ষী নং ১০।

(এই সভায় আরও একজন উপস্থিত ছিল যার নাম দেয়া হয়েছিল সার্জেন্ট শফি। কিন্তু তার পরিচয় উদ্ঘাটন করা যায় নি)।

এই সভায় ২ নং আসামী মোয়াজ্জেম সবাইকে তার ডায়রি এবং নোট বুক দেখান যাতে ‘বাংলাদেশ' নামে প্রস্তাবিত নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রধান দিকগুলো লিপিবদ্ধ ছিল। প্রস্তাবিত জাতীয় পতাকাও সেখানে দেখানো হয়।

৫১. ১৯৬৬ সালের জুন/জুলাই মাসে ৭ নং আসামী মাহফিজ উল্লাহ বিমান বাহিনীর কর্মকর্তাদের মধ্যকার ষড়যন্ত্রকারীদের একটি সভা আহ্বান করেন। তার বাসা— কোয়ার্টার নং ২৫/৩, আবিসিনিয়া লাইন, করাচী ঠিকানায় আহূত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন :

১. নূর মোহাম্মদ, আসামী নং-৫

২. মাহফিজ উল্লাহ, আসামী নং-৭

৩. এস এ সি মাহফুজুল বারী, আসামী নং-২২

৪. মোশারফ, সাক্ষী নং-৫

৫. কর্পোরাল জামাল উদ্দিন আহমেদ, সাক্ষী নং-১৪ এবং

৬. কর্পোরাল সিরাজুল ইসলাম, সাক্ষী নং-১৫।

এই সভায়ও অন্যান্য কয়েকজন উপস্থিত ছিল যাদের পরিচয় উদ্ধার করা যায় নি । এ সভার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল ৫ নং আসামী নূর মোহাম্মদের উপস্থিতি । কারণ তিনি এসেছিলেন নৌবাহিনী থেকে। ৭ নং আসামী মাহফিজউল্লাহর অনুরোধে ঢাকা থেকে সদ্য প্রত্যাগত ১৪ নং সাক্ষী কর্পোরাল জামাল এই সভায় উপস্থিত সদস্যদের সামনে পূর্ব পাকিস্তানে ষড়যন্ত্রকারীদের কাজকর্মের অগ্রগতি সম্পর্কে বলেন এবং উল্লেখ করেন যে, ১ নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য কয়েকজন উচ্চপদস্থ বেসামরিক কর্মকর্তা তাদের ভূমিকা আরও সক্রিয় করে তুলেছেন। ১৫ নং সাক্ষী সিরাজ তখন ছুটিতে যাচ্ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানে। ৭ নং আসামী মাহফিজ উল্লাহ তাকে বলেন যে, তিনি যেন পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানত ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য প্রথমে ঢাকাস্থ পি.এ.এফ. স্টেশনে ১১ নং আসামী ফজলুল হক এবং ২৩ নং আসামী সার্জেন্ট শামসুল হক পি.এ.এফ.-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

৫২. ১৯৬৬ সালের জুন/জুলাই মাসের কোনো এক সময় ২ নং আসামী মোয়াজ্জেম এবং ১২ নং সাক্ষী রমিজ কুমিল্লা সফর করার আয়োজন করেন। তাই ৩ নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিবকে প্রায়ই কুমিল্লা পাঠানো হয় এই খবরটি মেজর (তৎকালীন ক্যাপটেন) ২৪ নং আসামী শামসুল আলম এ.এম.সি-কে পৌঁছাবার জন্য। ২ নং আসামী মোয়াজ্জেম এবং ১২ নং সাক্ষী রমিজ মোয়াজ্জেমের গাড়িতে, হিলম্যান আইএম পি নং ৯৫৯১, করে চট্টগ্রাম ত্যাগ করেন। তারা ২৪ নং আসামী শামসুল আলমের কুমিল্লা শহরস্থ বাসভবনে যান এবং সেখানে বালুচ রেজিমেন্টের ক্যাপটেন মোহাম্মদ আবদুল মোতালিবের সাক্ষাৎ পান। ২৪ নং আসামী শামসুল আলম কুমিল্লার সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব পালনের কথা বলেছিলেন। তিনি ব্যাখ্যা করে বুঝাচ্ছিলেন যে, পরিকল্পনা কার্যকরী করার সময় সামরিক ইউনিটসমূহের অস্ত্র ভান্ডারগুলো দখল করে ফেলে তাদের যুদ্ধ করার সামর্থ্যকে অচল করে দিতে হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তিনি

দক্ষ জনশক্তির অভাব অনুভব করেন। তিনি শামসুল আলমকে চাকরিরত ও প্রাক্তন সৈনিকদের সঙ্গে তার যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে বলেন। ২৫ নং আসামী মোতালিব বলেন যে, তিনি পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস-এর একজন সদস্য হিসেবে তালিকাভুক্ত ছিলেন। পরে তাদের পাঁচজনকে একটি গাড়িতে করে কুমিল্লা সেনানিবাসে ২৬ নং আসামী মোহাম্মদ শওকত আলী মিয়া এ.ও.সি-এর বাসায় নিয়ে আসা হয় এবং সেখানে তাদের সঙ্গে ৩ নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিবও যোগ দেন। ২৬ নং আসামী শওকত ২ নং আসামী মোয়াজ্জেমকে জানান যে, তিনি ঢাকাতে ১৩ নং সাক্ষী ক্যাপটেন মোহাম্মদ আবদুল আলীম ভূঁইয়া এ.ও.সি এবং ২৭ নং আসামী ক্যাপটেন খন্দকার নাজমুল হুদা এ.ও.সি-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন এবং ঐ দু'জন ঐ অফিসারই সংগঠন সম্পর্কে আরও বেশি করে জানতে চেয়েছেন। এমতাবস্থায় ২ নং আসামী মোয়াজ্জেম কথা দেন যে, অবিলম্বে ঢাকাতে একটি সভা আহ্বান করা হবে।

৫৩. একই মাসে (জুলাই ১৯৬৬) ৭ নং সাক্ষী সাইদুর রহমানের সঙ্গে চট্টগ্রামের এক বাড়িতে একটি অনুষ্ঠানে ২ নং আসামী মোয়াজ্জেমের হঠাৎ করে দেখা হয়ে যায়। সেখানে ২নং আসামী মোয়াজ্জেম ৭ নং সাক্ষী সাইদুর রহমানের কাছে প্রকাশ করেন যে, ১২নং আসামী মানিক চৌধুরী গ্রেফতারের আগেই অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের জন্য ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনারের ফার্স্ট সেক্রেটারীর কাছে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্রের একটি তালিকা পৌঁছে দেবার কথা। ২ নং আসামী মোয়াজ্জেম এরপর ৭ নং সাক্ষী সাইদুর রহমানকে জিগ্যেস করেন যে, তিনি মিঃপি.এন.ওঝাকে চিনেন কিনা। ৭ নং সাক্ষী সাইদুর রহমান এ প্রশ্নের হ্যাঁ-সূচক জবাব দেন। ফলে ২ নং আসামী মোয়াজ্জেম তাকে অনুরোধ করেন, মিঃ পি.এন. ওঝার কাছে অস্ত্রশস্ত্রের একটি তালিকা পৌছে দেবার জন্য। ৭ নং সাক্ষী সাইদুর রহমান সন্দেহভাজন ব্যক্তি হিসেবে তার উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে বলে ঐ কাজ করতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

৫৪. অল্প কয়েকদিন পরে একদিন সকালবেলা মিঃ পি.এন.ওঝা ৭ নং সাক্ষী সাইদুর রহমানের চট্টগ্রামের বাসভবনে এসে হাজির হন এবং অনুযোগের ভাষায় তাকে বলেন যে, তার অনুরোধ সত্ত্বেও সে (৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমান) তার ঢাকাস্থ অফিসে দেখা করেন নি । তখন সেইখানে বসেই ৭ নং সাক্ষী সাইদুর রহমান মিঃপি.এ.ওঝাকে অস্ত্রশস্ত্রের তালিকা সংক্রান্ত ২ নং আসামী মোয়াজ্জেমের দেওয়া সংবাদটি জ্ঞাপন করান ।

৫৫. পরের দিন মিঃ 'পি.এন.ওঝার নির্দেশমত ৭ নং সাক্ষী সাইদুর রহমান ২ নং আসামী মোয়াজ্জেমের নিকট থেকে পূর্বোক্ত অস্ত্রশস্ত্রের তালিকাটি সংগ্রহ করেন এবং তা চট্টগ্রাম রেল স্টেশনে মিঃ পি.এন.ওঝার কাছে হস্তান্তর করেন। সেই সময় মিঃ পি.এন.ওঝা ঢাকাতে তার সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য ৭ নং সাক্ষী সাইদুর রহমানকে একটি কোড শব্দ প্রদান করেন এবং ২ নং আসামী মোয়াজ্জেমকে ঢাকায় তার সঙ্গে দেখা করতে বলার জন্য ৭ নং সাক্ষী সাইদুর রহমানকে বলেন।

৫৬. এর কয়েকদিন পরে ২ নং আসামী মোয়াজ্জেম ৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমানের মাধ্যমে ঢাকার ধানমন্ডিস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনারের বাসভবনে মিঃ পি.এন.ওঝার সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার আয়োজন করেন। সেখানে পি.এন.ওঝা ২ নং আসামী মোয়াজ্জেমকে আশ্বাস দেন যে, তিনি তার (২নং আসামী মোয়াজ্জেমের) প্রদত্ত অস্ত্রের তালিকা ভারত সরকারের অনুমোদনের জন্য পাঠাবেন। এবং তিনি সাময়িকভাবে ষড়যন্ত্রকারীদেরকে অর্থ সরবরাহ করতে অপারগ বলে জানান ।

৫৭. ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসের কোনো এক সময় ২৬ নং আসামী শওকত ঢাকা সফর করেন এবং ১৩ নং সাক্ষী আলীমের সঙ্গে অর্ডিন্যান্স মেসে অবস্থান করেন। ঐ সন্ধ্যায়ই ২ নং আসামী মোয়াজ্জেম পূর্বোক্ত মেসে ১৩ নং সাক্ষী আলীম এবং ২৬ নং আসামী শওকতের সঙ্গে দেখা করেন। ঐখানে ২ নং আসামী মোয়াজ্জেম ঘোষণা করেন যে, আগামীকাল সকালে ১২ নং সাক্ষী রমিজের মোহাম্মদপু হাউজিং এস্টেটের বাসায় তিনি একটি সভা আহ্বান করেছেন। এই সভায় নিম্নোক্ত ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন :

১. মোয়াজ্জেম, আসামী নং-২

২. স্টুয়ার্ড মুজিব, আসামী নং-৩

৩. সুলতান, আসামী নং-৪

৪. নামজুল হুদা, আসামী নং-২৭

৫. শওকত, আসামী নং-২৬ এবং ৬. আলীম, সাক্ষী নং-১৩ ।

এই সভায় ২ নং আসামী মোয়াজ্জেম ষড়যন্ত্রকারীদেরকে বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা সম্বলিত একটি ডায়েরি এবং একটি নোটবুক দেখান। ২ নং

আসামী মোয়াজ্জেম এতে দাবি করেন যে, তিনি ষড়যন্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের জন্য ইতোমধ্যেই ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। সভায় তিনি এই আশা ব্যক্ত করেন যে, উপস্থিত সদস্যরা যশোর এবং রংপুর অঞ্চলে কাজ পরিচালনার জন্য গ্রুপে আরও কিছু সামরিক অফিসার অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করবেন। তিনি দাবি করেন যে, চট্টগ্রামের কাজ সমাধা করার জন্য ২৮ নং আসামী ক্যাপটেন এ. এন. এম নুরুজ্জামান এবং তার নিজস্ব নৌবাহিনী যথেষ্ট। ২৫ নং আসামী মোতালেব এবং ২৪ নং আসামী শামসুল আলম কুমিল্লায় যেভাবে কাজ করেছেন ২ নং আসামী মোয়াজ্জেম এই সভায় তার প্রশংসা করেন ।

৫৮. ঐ একই মাসে (আগস্ট, ১৯৬৬) ২৭ নং আসামী নাজমুল হুদা, ২৪ নং আসামী শামসুল আলম, ১৩ নং সাক্ষী আলীম এবং ২৬ নং আসামী শওকত দাউদকান্দি রেস্ট হাউসে মিলিত হন। তারা উপলব্ধি করেন যে, ষড়যন্ত্রকারীদের নেতৃত্ব কয়েকজন প্রবীণ (সিনিয়র) সামরিক অফিসারের ওপর অর্পিত হওয়া উচিত। তারা স্থির করলেন যে, তারা ২ নং আসামী মোয়াজ্জেমের কাছ থেকে গ্রুপের সংগঠনের সংখ্যা ও পরিচয় জেনে নিবেন।

৫৯ ঐ একই মাসে (আগস্ট, ১৯৬৬) ২নং আসামী মোয়াজ্জেম গ্রুপের তহবিল থেকে গ্রুপের কাজের সুবিধার্থে একটি গাড়ি কিনতে সাহায্য করার জন্য ১২ নং সাক্ষী রমিজকে ৫০০০ টাকা প্রদান করেন ।

৬০. ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের কোনো এক সময় ২ নং আসামী মোয়াজ্জেম ১২ নং সাক্ষী রমিজের মোহাম্মদপুর হাউজিং এস্টেটের ১২-৮/৮ নং ফ্লাটে একটি সভা আহ্বান করেন। নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন :

১. মোয়াজ্জেম, আসামী নং-২

২. স্টুয়ার্ড মুজিব, আসামী নং-৩

৩. সুলতান, আসামী নং-৪

৪. শামসুর রহমান, আসামী নং-১৯

৫. শামসুল আলম, আসামী নং-২৪

৬. মোতালেব, আসামী নং-২৫

৭. নাজমুল হুদা, আসামী নং-২৭

৮. রমিজ, সাক্ষী নং-১২ এবং

৯. আলীম, সাক্ষী নং-১৩ ।

এই সভায় ২ নং আসামী মোয়াজ্জেম ষড়যন্ত্রকারীদের কাছে প্রকাশ করেন যে, ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তাদের চাহিদা অনুযায়ী অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করার ব্যাপারে একমত হয়েছেন। তিনি ২৫ নং আসামী মোতালেবকে বিস্তৃতভাবে বুঝিয়ে বলেন যে, প্রাক্তন সৈনিকদেরকে বিভিন্ন গ্রুপে সংগঠিত করতে হবে এবং তাদেরকে নানা ধরনের অস্ত্রশস্ত্রের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। ২ নং আসামী মোয়াজ্জেম বিভিন্ন সেক্টরের সেক্টর কমান্ডারদের আর্থিক প্রয়োজনের বিষয়টি নোট করে নেন। ২৭ নং আসামী নাজমুল হুদা, ২৪ নং আসামী শামসুল আলম এবং ১৩ নং সাক্ষী আলীম সভার কার্যবিবরণীতে হস্তক্ষেপ করে প্রস্তাব করেন যে, নেতৃত্ব কয়েকজন প্রবীণ (সিনিয়র) সামরিক অফিসারের ওপর ন্যস্ত হওয়া প্রয়োজন। ১৯ নং আসামী শামসুর রহমান এ বিষয়ক আলোচনা সংক্ষিপ্ত করার জন্য অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল এম.এ.জি. ওসমানীর সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা বলেন। ২ নং আসামী মোয়াজ্জেম ঘোষণা করেন যে, স্বাধীনতা লাভের পরই দেশে সামরিক আইন জারি করা হবে এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসার পর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ১২ নং সাক্ষী রমিজ মত প্রকাশ করে বলেন যে, সামরিক অভ্যুত্থান চলাকালীন সময়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু রাখা হবে পি.আই.এ এবং পি.এ.এফ,-এর বিমান এবং রেডিও'র মাধ্যমে। ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে একজন এই মত ব্যক্ত করেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানে যে সমস্ত পূর্ব পাকিস্তানি রয়েছে তাদেরকে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক অভ্যুত্থানের সময় যে সমস্ত পশ্চিম পাকিস্তানি বন্দী হবে তাদেরকে বিনিময় করা হবে।

৬১. ঐ একই মাসে (সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬) ৭ নং সাক্ষী সাইদুর রহমান দ্বিতীয়বারের মত ২ নং আসামী মোয়াজ্জেম এবং ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি মিঃ পি.এন.ওঝার মধ্যে পূর্বোক্ত বাড়িতে বৈঠকের ব্যবস্থা করেন। মিঃ পি.এন.ওঝা ২ নং আসামী মোয়াজ্জেমকে বলেন যে, ভারত সরকার ষড়যন্ত্রকারীদেরকে অস্ত্র সরবরাহ করতে সম্মত হয়েছে এবং তিনি

২ নং আসামী মোয়াজ্জেমকে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহের তারিখ যথাসময়ে জানানো হবে বলে আশ্বাস দেন ।

৬২. ১৯৬৬ সালের অক্টোবরে ১৯ নং আসামী শামসুর রহমানের পরামর্শে গ্রুপের প্রতি প্রবীণ সামরিক অফিসারদের সমর্থন নিশ্চিত করার জন্য ২ নং আসামী মোয়াজ্জেম চট্টগ্রামে তার বাসা ‘এ্যাংকরেজ'-এ এক সভা আহ্বান করেন। অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল এম.এ.জি. ওসমানী এই সভায় আমন্ত্রিত ছিলেন। নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন :

১. মোয়াজ্জেম, আসামী নং ২

২. শামসুর রহমান, আসামী নং ১৯

৩. রমিজ, সাক্ষী নং ১২।

সভায় ২ নং আসামী মোয়াজ্জেম ষড়যন্ত্রের প্রধান প্রধান দিক উল্লেখ করেন । এখানে তিনি একথাও প্রকাশ করেন যে, ভারতের সঙ্গে তিনি একটি চুক্তিতে উপনীত হয়েছেন ('a gentlemen'sagreement') যার শর্ত অনুযায়ী তারা স্বাধীনতা ঘোষণার পর পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান সীমা অতিক্রম করবে না এবং পশ্চিম পাকিস্তানের যে-কোনো বাধা বা হস্তক্ষেপকে তারা সমুদ্র ও আকাশপথে বাধা প্রদান করে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক বিদ্রোহকে সমর্থন করবে। কর্নেল (অবঃ) এম.এ.জি. ওসমানী কথাবার্তাগুলো কেবল শুনেছিলেনই।

৬৩. ১৯৬৬ সালের অক্টোবর মাসে ৭ নং সাক্ষী সাইদুর রহমান ২ নং আসামী মোয়াজ্জেম এবং মিঃ পি.এন.ওঝার মধ্যে ঢাকাস্থ ধানমন্ডির পূর্বোক্ত বাড়িতে তৃতীয়বারের মত একটি সভার আয়োজন করেন। এই সভায় মিঃ পি.এন. ওঝা দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে, ভারতের আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের কারণে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করার তারিখ নির্ধারণ করা যায় নি। মিঃ ওঝা ষড়যন্ত্রকারীদেরকে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের জন্য ভারতের সাধারণ নির্বাচন শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার উপদেশ দেন।

৬৪. ঐ একই মাসে (অক্টোবর, ১৯৬৬) ৩ নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিব ১১ নং সাক্ষী মোহসিনের কাছে আর্থিক সাহায্যের জন্য বলেন। ১১নং সাক্ষী মোহসিন তাকে ২০০০ টাকা দেন । ৩ নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিব বলেন যে, অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদ সংগ্রহের জন্য তিন/ চার লাখ টাকা প্রয়োজন। এতে ১১

নং সাক্ষী ভয় পেয়ে ক্ষেপে যান এবং ৩ নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিবকে তক্ষুণি তার বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে বলেন।

৬৫. ১৯৬৭ সালের ২৩ জানুয়ারি কিংবা তার দু'একদিন আগে-পরে ১২ নং আসামী মানিক চৌধুরী ডিটেনশন আদেশ থেকে মুক্তি পান।

৬৬. ১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ৭ নং আসামী মাহফিজ উল্লাহ ঢাকা আসেন এবংগ্রুপভুক্ত বিমান বাহিনীর কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ঢাকাস্থ আওলাদ হোসেন মার্কেটে ১৬ নং আসামী এম.এ. রাজ্জাকের দোকানে। নিম্নোক্তরা এই সভায় উপস্থিত ছিলেন :

১. মাহফিজউল্লাহ, আসামী নং ৭

২. এম.এ. রাজ্জাক, আসামী নং ১৬

৩. সার্জেন্ট শামসুল হক, আসামী নং ২৩ এবং

৪. সিরাজ, সাক্ষী নং ১৫।

এই সভায় আরও কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন যাদের পরিচয় উদ্ধার করা যায় নি । ষড়যন্ত্রকারীদের সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল এই সভার আলোচ্য বিষয়।

৬৭. ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে ২ নং আসামী মোয়াজ্জেমের চাকরি পূর্ব পাকিস্তান অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন কর্তৃপক্ষের অধীনে স্থানান্তর করা হয় এবং তাকে বরিশালে পোস্টিং দেয়া হয়।

৬৮. ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে ১৫ নং সাক্ষী সিরাজ এবং ৭ নং আসামী মাহফিজউল্লাহ উভয়েই করাচিতে ফিরে আসেন ।

৬৯. ঐ একই মাসে (মার্চ, ১৯৬৭) ২ নং আসামী মোয়াজ্জেম ১২ নং আসামী মানিক চৌধুরীর মাধ্যমে মিঃ পি.এন.ওঝার ঢাকাস্থ বাসভবনে তার সঙ্গে চতুর্থ বৈঠকের আয়োজন করেন। তিনি তাদেরকে জানান যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহের তারিখ নির্ধারিত হবে না। মিঃ ওঝা তাদের কাজকর্মের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছিলেন। সভার শেষে পি.এন. ওঝা তাদেরকে নগদ ৫০০০ টাকা প্রদান করেন।

৭০. ১৯৬৭ সালের ৩১ মার্চ ২ নং আসামী মোয়াজ্জেম, ১২ নং আসামী মানিক চৌধুরী ও ৭ নং সাক্ষী সাইদুর রহমানকে সঙ্গে নিয়ে পি.এন.ওঝার সঙ্গে তার ঢাকাস্থ বাসভবনে পঞ্চমবারের মত সাক্ষাৎ করেন। এই সভায় মিঃ পি.এন.ওঝা বলেন যে, ভারত সরকার মনে করে যে, অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করার আগে ষড়যন্ত্রকারী গ্রুপের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কয়েকজন ভারতীয় কর্মকর্তার একটি বৈঠক হওয়া প্রয়োজন। মিঃ পি.এন. ওঝা ঐ বৈঠকের স্থান হিসেবে পাকিস্তান সীমান্ত থেকে অনতিদূরে ভারতের আগরতলার কথা বলেন। তিনি ২ নং আসামী মোয়াজ্জেমকে ষড়যন্ত্রকারী গ্রুপের তিনজন প্রতিনিধির নাম প্রস্তাব করতে বলেন। এই সভার পর মিঃ ওঝা তাদেরকে ১০,০০০ টাকা প্রদান করেন।

৭১. ঐ একই মাসে (মার্চ, ১৯৬৭) ২ নং আসামী মোয়াজ্জেম, ৩ নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিব এবং ১২ নং সাক্ষী রমিজ ঢাকার মোহাম্মদপুর হাউজিং এস্টেটের ১২ নং সাক্ষী রমিজের বাসভবনে মিলিত হন। সেখানে ২ নং আসামী মোয়াজ্জেম ১২ নং সাক্ষী রমিজকে বলেন যে, তার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ টাকা রয়েছে যা পি.এন.ওঝার কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য হিসেবে পাওয়া গিয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, তারা ১০ নং আসামী রুহুল কুদ্দুস এবং ৬ নং আসামী এ.এফ. রহমানের নিকট থেকে আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করেছে। এই সভায় ষড়যন্ত্রকারীরা সভা অনুষ্ঠান এবং সার্বক্ষণিক কর্মীদের থাকার জন্য আরেকটি বাড়ি ভাড়া করার কথা স্থির করেন। ষড়যন্ত্রকারীদের কার্যকলাপ গোপন রাখার জন্য একটি লোক দেখানো ব্যবসা খোলার বিষয়ও এখানে স্থির করা হয়। ১২ নং সাক্ষী রমিজ এ ধরনের একটি ব্যবসা চালু করতে সাহায্য করার জন্য ১৬ নং আসামী, তার বন্ধু, আবু শামস লুৎফুল হুদার নাম প্রস্তাব করেন।

৭২. ঐ একই মাসে (মার্চ, ১৯৬৭) আরেকটি গ্রুপ সভা অনুষ্ঠিত হয় পূর্বোক্ত ফ্লাটেই । নিম্নোক্তরা সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন :

১. মোয়াজ্জেম, আসামী নং ২

২. স্টুয়ার্ড মুজিব, আসামী নং ৩

৩. সামাদ, আসামী নং ৮

৪. শামসুর রহমান, আসামী নং ১৯

৫. মোতালেব, আসামী নং ২৫

৬. রমিজ, সাক্ষী নং ১২ এবং

৭. লুৎফুল হুদা, সাক্ষী নং ১৬।

এই সভায় একটি ট্রান্সমিটার সেট সংগ্রহ করা এবং ট্রান্সমিটার অপারেটরদের প্রশিক্ষণ প্রদানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়। এখানে আরও একটি বিষয় স্থির করা হয় যে, গ্রুপের কার্যকলাপ ঢাকা দেবার জন্য যে ব্যবসা চালু করা হচ্ছে সে বাবদ ১২ নং সাক্ষী রমিজের নিয়ন্ত্রণাধীনে একটি বড় অঙ্কের টাকা আলাদা করে রাখা হবে ।

৭৩. অল্প কয়েকদিন পরেই (মার্চ, ১৯৬৭) ১২ নং সাক্ষী রমিজ ২ নং আসামী মোয়াজ্জেমের নিকট থেকে ৩ নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিবের মাধ্যমে ২৫,০০০ টাকা গ্রহণ করেন। এই টাকা থেকে ১২ নং সাক্ষী রমিজ ব্যবসায়ে খাটানোর জন্য ১৬ নং সাক্ষী লুৎফুল হুদাকে ৫০০০ টাকা প্রদান করেন। বাকি ২০,০০০ টাকার মধ্যে ১৮,৬৮৯ টাকা ১২ নং সাক্ষী রমিজ ষড়যন্ত্রকারীদের বিবিধ পর্যায়ের কাজে খরচ হিসেবে দেখান।

৭৪. ১৯৬৭ সালের ১৪ মার্চ ৩ নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিব সার্বক্ষণিকভাবে ষড়যন্ত্রমূলক কাজে নিয়োজিত থাকার দায়ে পাকিস্তান নৌবাহিনী থেকে পরিত্যক্ত হন।

৭৫. এর প্রায় পনের দিন পরে (মার্চ, ১৯৬৭) ১৯ নং আসামী শামসুর রহমান ফরিদপুরের ডেপুটি কমিশনার মিঃ সিদ্দিকুর রহমানের নিকট তার বন্ধু মিঃ মুজিবুর রহমানকে সাহায্য করার জন্য একটি চিঠি লেখেন। ৩ নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিব ১৬ নং সাক্ষী লুৎফুল হুদাসহ ফরিদপুরে যান এবং মিঃ সিদ্দিকুর রহমানের নিকট ঐ চিঠি হস্তান্তর করেন।

৭৬. ১৯৬৭ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকাস্থ গ্রীন স্কোয়ারের ১৩ নং বাড়িটি গ্রুপের জন্য ভাড়া নেয়া হয়। ১৯৬৭ সালের ১ মে এই বাড়িতে ওঠা হয়। নিম্নোক্ত সার্বক্ষণিক কর্মিগণ সেই বাড়িতে থাকতেন :

১. স্টুয়ার্ড মুজিব, আসামী নং-৩

২. সামাদ, আসামী নং-৮

৩. দলিল উদ্দিন, আসামী নং-৯

৪. প্রাক্তন সুবেদার জালাল উদ্দিন আহমেদ, সাক্ষী নং-১৭ এবং

৫. মোহাম্মদ গোলাম আহমেদ, সাক্ষী নং-১৮।

২ নং আসামী মোয়াজ্জেম তার হিলম্যান গাড়িটিও গ্রুপের কাজে ব্যবহারের জন্য ৩ নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিবের নিয়ন্ত্রণাধীনে ঐ বাড়িতে রাখেন। এই গাড়ির নম্বর 'হিলম্যান' নং- ইবিএ-৯৫৯১।

৭৭. ১৯৬৭ সালের এপ্রিল মাসের কোনো এক সময় ৭ নং আসামী মাহফিজউল্লাহ ১৯ নং সাক্ষী কর্পোরাল হাই এ.কে.এম.এ.-এর সঙ্গে তার কোয়ার্টার ডমেস্টিক এরিয়া পি.এ.এফ. কোরাঙ্গী ক্রিক করাচিতে সাক্ষাৎ করেন। ৭ নং আসামী মাহফিজ উল্লাহ সেখানে ডেকোরেশন পিস হিসেবে একটি নকল হ্যান্ড গ্রেনেড দেখতে পান এবং ১৯ নং সাক্ষী হাই সাহেবের নিকট থেকে সেটি নিয়ে আসেন।

৭৮. ১৯৬৭ সালের মে মাসে ৭ নং আসামী মাহফিজ উল্লাহ২৯ নং আসামী সার্জেন্ট জলিলের বাসায় একটি সভা আহ্বান করেন। এই বাসার ঠিকানা হচ্ছে—১৪/৪ জি, ক্লেটন কোয়ার্টাস, করাচী। নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন

১. মাহফিজ উল্লাহ, আসামী নং-৭

২. বারি, আসামী নং-২২

৩. সার্জেন্ট শামসুল হক, আসামী নং-২৩

৪. সার্জেন্ট আবদুল জলিল, আসামী নং-২৯

৫. মোহাম্মদ মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী, আসামী নং-৩০

৬. শামসুদ্দিন, সাক্ষী নং-৬

৭. কর্পোরাল জামাল, সাক্ষী নং-১৪ এবং

৮. সিরাজ, সাক্ষী নং-১৫।

ঐ সভায় পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগত এবং সেখানে গ্রুপের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ২৩ নং আসামী সার্জেন্ট শামসুল হক উপস্থিত সবাইকে জানান যে, ২ নং আসামী মোয়াজ্জেম ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও আর্থিক সাহায্য প্রদান করার বিষয়ে ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে রাজি করাতে সফল হয়েছেন। তিনি ঐ সভায় উপস্থিত ষড়যন্ত্রকারীদের কাছে ব্যাখ্যা করে বলেন যে, 'ডি' দিবসে পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র জনগণ সামরিক অভ্যুত্থানের পক্ষে থাকবে। সার শেষে ৭ নং আসামী মাহফিজ উল্লাহ তার পকেট থেকে একটি নকল হ্যান্ড গ্রেনেড বের করেন এবং সবার সামনে সেটি নিক্ষেপ করার নিয়ম পদ্ধতি প্রদর্শন করেন। তিনি গ্রুপের সকল সদস্যকেও অনুরূপভাবে হ্যান্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ অনুশীলন করতে বলেন। ২৯ নং আসামী জলিলের বাসায় রেখে যান। তিনি বলেন যে, তিনি হ্যান্ড গ্রেনেডটি যেভাবে সংগ্রহ করেছেন সেভাবে আরও ছোট ছোট অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে সেগুলোর ব্যবহারের প্রশিক্ষণ শুরু করবেন ।

৭৯. ১৯৬৭ সালের মে মাসের কোনো এক সময় ৭ নং আসামী মাহফিজ উল্লাহ ১৫ নং সাক্ষী সিরাজের কাছে প্রকাশ করেন যে, ৬ নং আসামী শামসুদ্দিনও তাদের গ্রুপের একজন সদস্য ছিল এবং বিমান বাহিনীর কর্মকর্তারা ৩১ নং আসামী লেফটেন্যান্ট এস.এম.এম রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছেন। ৭ নং আসামী মাহফিজ উল্লাহ করাচিস্থ কারসা অফিসার্স কোয়ার্টাসে ৩১ নং আসামী লেফটেন্যান্ট রহমানের বাসায় অনুষ্ঠিতব্য সভায় ৬ নং সাক্ষী সামসুদ্দিন এবং ৩০ নং আসামী মাহবুব উদ্দিনকে হাজির করানোর জন্য ১৫ নং সাক্ষী সিরাজকে নির্দেশ প্রদান করেন ।

৮০. একই মাসের (মে, ১৯৬৭) নির্ধারিত দিনে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ ৩১নং আসামী লেফটেন্যান্ট রহমানের বাসায় অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন :

১. মাহফিজ উল্লাহ, আসামী নং-৭

২. লেঃ রহমান, আসামী নং-৩১

৩. মাহবুব উদ্দিন, আসামী নং-৩০

৪. সামসুদ্দিন, সাক্ষী নং-৬ এবং

৫. সিরাজ, সাক্ষী নং-১৫।

এছাড়া কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন যাদের পরিচয় উদ্ঘাটন করা যায় নি। সভায় গ্রুপের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা হবার পর ৩১ নং আসামী লেঃরহমান উপস্থিতদের উদ্দেশে বলেন যে, আরও বেশিসংখ্যক বাঙালি চাকরিরত কিংবা প্রাক্তন সৈনিককে গ্রুপে সংগঠিত করতে হবে এবং তাদেরকে পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তর করার পথ ও পদ্ধতি বের করতে হবে।

৮১. ১৯৬৭ সালের জুন মাসের শেষদিকে কোনো একদিন ২নং আসামী মোয়াজ্জেম গ্রুপের জন্য নতুন সদস্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ১৭ নং সাক্ষী জালাল এবং ৮ নং আসামী সামাদকে এক সফরে পাঠান। এই সূত্রে উক্ত দুই ব্যক্তি কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, খুলনা এবং যশোর সফর করেন। তারা খুলনায় প্রাক্তন সুবেদার ৩২ নং আসামী এ. কে. এম. তাজুল ইসলামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং সে অঞ্চলে গ্রুপের কাজকর্মের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। ৩২ নং আসামী তাজুল ইসলাম তার সংগৃহীত ষড়যন্ত্রকারীদেরকে ঐ সফরকারী দলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।

৮২. ১৯৬৭ সালের জুন মাসের ২য় কিংবা ৩য় সপ্তাহে ৩১ নং আসামী লেঃ রহমান পূর্বোক্ত গ্রুপের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, তার বাসা – বাংলো নং- ই/১৬, অফিসার্স কোয়ার্টার, কায়সায়, করাচিতে এক সভা অনুষ্ঠান করেন। নিম্নোক্ত ষড়যন্ত্রকারীরা ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন :

১. মাহফিজ উল্লাহ, আসামী নং ৭

২. বারি, আসামী নং ২২

৩. মাহবুব উদ্দিন, আসামী নং ৩০

৪. লেঃ রহমান, আসামী নং ৩১

৫. সার্জেন্ট সামসুদ্দিন, সাক্ষী নং ৬ এবং

৬. সিরাজ, সাক্ষী নং ১৫।

আরও অল্প কয়েকজন এই সভায় উপস্থিত ছিলেন যাদেরকে চিহ্নিত করা যায় নি । সভায় ৩১ নং আসামী লেঃ রহমান অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশে বলেন যে, ২নং আসামী মোয়াজ্জেম গ্রুপে নতুন অন্তর্ভুক্তি বন্ধ রাখার নির্দেশ পাঠিয়েছেন। ৩০ নং আসামী মাহবুব উদ্দিন এবং ২২ নং আসামী বারির

পরামর্শক্রমে ৩১ নং আসামী লেঃ রহমান ৬ নং সাক্ষী সামসুদ্দিনকে (সে তখন ঢাকায় স্থানান্তর হয়ে যাচ্ছিলো) নির্দেশ দেন যে, সে যেনো ঢাকায় গিয়ে ২ নং আসামী মোয়াজ্জেমের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং জেনে নেয় যে তিনি (২নং আসামী মোয়াজ্জেম) ঢাকাতে তার (৩১ নং আসামী লেঃ রহমানের) উপস্থিতি কামনা করে কিনা। যদি তা করে তাহলে ৬ নং আসামী সামসুদ্দিন যেন তাকে এই মর্মে একটি টেলিগ্রাম পাঠায় যে, 'বজলু গুরুতর অসুস্থ, মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছে।' ২২ নং আসামী বারি এবং ৩০ নং আসামী মাহবুব উদ্দিনের অনুসরণে গ্রুপের সদস্যরা সাময়িকভাবে করাচিস্থ গ্রুপের জন্য কেবল তহবিল সংগ্রহ করবে বলেও সভায় স্থির করা হয়।

৮৩. ১৯৬৭ সালের জুন মাসে ২ নং আসামী মোয়াজ্জেম ১৩, গ্রীন স্কোয়ার, ঢাকাতে কয়েকটি সভা আহ্বান করেন। এই সভাগুলোতে নিম্নোক্তরা উপস্থিত ছিলেন :

১. মোয়াজ্জেম, আসামী নং-২

২. স্টুয়ার্ড মুজিব, আসামী নং-৩

৩. সুলতান, আসামী নং-৪

৪. দলিল উদ্দিন, আসামী নং-৯

৫. রিসালদার শামসুল হক, আসামী নং-২০

৬. এম. আলী রেজা, আসামী নং-৩৩

৭. ক্যাপটেন খুরশীদ উদ্দিন আহমদ, এ.এম.সি. আসামী নং-৩৪

৮. রমিজ, সাক্ষী নং-১২ .

৯. জালাল উদ্দিন, সাক্ষী নং-১৯ এবং

১০. আনোয়ার হোসাইন, সাক্ষী নং-২০।

এই সভাগুলোর মূল উদ্দেশ্য ছিলো ভারতে যাবার জন্যে প্রতিনিধি নির্বাচন করা। এই সূত্রে ১৯নং আসামী শামসুর রহমানকে জাকার্তায় এবং ২৫ নং আসামী মোতালেবকে পেশওয়ারে টেলিগ্রাম করা হয়। কিন্তু তারা আসেন নি।

৩৪ নং আসামী খুরশীদ সদ্য করাচি থেকে ঢাকা পৌঁছেছেন। তিনি ভারতের আগরতলায় প্রতিনিধি প্রেরণের পরিকল্পনা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন । পূর্বোক্ত সভাসমূহে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় :

ক. সীমান্তের ওপারে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আসন্ন বৈঠকে ৩৩ নং আসামী রেজা এবং তার সঙ্গে ৩ নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিব প্রতিনিধিত্ব করবে।

খ. প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিবেন ৩৩ নং আসামী রেজা।

গ. ষড়যন্ত্রকারী গ্রুপের সদস্যদেরকে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের যে তালিকা দেখিয়ে ৩৩ নং আসামী রেজার নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে সেই তালিকাই ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হবে।

ঘ. আগরতলার সভায় অস্ত্র চুক্তি চূড়ান্ত করা হবে এবং বর্ধিত আর্থিক সাহায্যের কথা বলা হবে।

ঙ. প্রতিনিধিরা ফেনী সীমান্ত দিয়ে গোপনে আগরতলা যাবেন, এবং

চ. ১৭নং আসামী জালাল উদ্দিন প্রতিনিধিদের সীমান্ত অতিক্রমের বিষয়টি তদারক করবেন এবং এ ব্যাপারে তার প্রভাব খাটাবেন, এমনকি প্রয়োজন হলে সীমান্তে কর্তব্যরত ই.পি.আর কর্মকর্তাদেরকে ঘুষ দিবেন যাতে প্রতিনিধিদের সীমান্ত অতিক্রম নিশ্চিত ও নিরাপদ করা যায় ।

৮৪. ১৯৬৭ সালের জুন মাসের ৩য় কিংবা ৪র্থ সপ্তাহে ২ নং আসামী মোয়াজ্জেম ১২ নং আসামী মানিক চৌধুরীকে ঢাকায় ডেকে এনে তার হাতে একটি খাম দিয়ে সেটি মিঃ পি.এন.ওঝাকে পৌঁছাতে বলেন। ১২ নং আসামী মানিক চৌধুরী ঐদিন সন্ধ্যায়ই তা করেন। এই খামের মধ্যে ছিলো কতগুলো কোড শব্দ, প্রতিনিধিরা যে স্থান থেকে সীমান্ত অতিক্রম করবেন তার নাম এবং উপরোল্লেখিত প্রতিনিধিদের নাম ।

৮৫. পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৬৭ সালের ১১ জুলাই কথা অনুযায়ী—৩৩ নং আসামী রেজা এবং ৩ নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিবসহ নিম্নোক্ত ষড়যন্ত্রকারীরা ফেনী পৌছেন (জেলা নোয়াখালী) প্রতিনিধিরা যাতে নিরাপদে সীমান্ত পার হয়ে ভারতের আগরতলা পৌঁছতে পারেন সেজন্যই অন্যরা তাদের সঙ্গে সীমান্ত পর্যন্ত যান :

১. স্টুয়ার্ড মুজিব, আসামী নং ৩

২. সামাদ, আসামী নং ৮

৩. দলিল উদ্দিন, আসামী নং ৯

৪. রেজা, আসামী নং ৩৩ এবং

৫. জালাল, সাক্ষী নং ১৭ ।

উপরোল্লেখিত ষড়যন্ত্রকারীরা ফেনী রেল স্টেশনের কাছে হোটেল ডিনোফায় অবস্থান করেন। ঐ দিন সন্ধ্যায়ই ৩ নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিব টেলিফোন করে ১২ নং সাক্ষী রমিজকে ফেনী আসতে বলেন। ফলে, ১২ নং সাক্ষী রমিজ ২০ নং সাক্ষী আনোয়ার হোসেনকে সঙ্গে নিয়ে পি.আই. এ'র একটি স্টাফ গাড়িতে করে ঐদিন রাতেই ফেনী পৌঁছেন।

৮৬. ১৯৬৭ সালের ১২ জুলাই রাত ২টা ৩০ মিনিট থেকে ৪টা ৩০ মিনিটের মধ্যে ১২ নং সাক্ষী রমিজ, ২০ নং সাক্ষী আনোয়ার হোসেন এবং ৯ নং আসামী দলিল উদ্দিন ছাড়া সবাইকে পি.আই.এ'র স্টাফ গাড়িতে করে নিয়ে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের কাছাকাছি বড় রাস্তায় নামিয়ে দেন। এরপর ১২ নং সাক্ষী রমিজ এবং ২০ নং সাক্ষী আনোয়ার হোসেন ঐ রাতেই চট্টগ্রাম ফিরে আসেন। ১৭ নং সাক্ষী জালাল উদ্দিন প্রতিনিধিদ্বয়ের ভারতীয় স্থলভাগে প্রবেশ তদারক করেন ।

৮৭. ১৯৬৭ সালের ১৩ জুলাই রাতে কোনো এক সময় ঐ প্রতিনিধিদ্বয় ৩৩ নং আসামী রেজা এবং ৩ নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিব আগরতলা থেকে একটি ট্রাকে করে ফেনীতে হোটেল ডিনোফায় ফিরে আসেন।

৮৮. ১৯৬৭ সালের ১৫ জুলাই ২ নং আসামী মোয়াজ্জেমকে উক্ত সভার ফলাফল জানানোর জন্য তারা বরিশালের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান।

৮৯. ১৯৬৭ সালের জুলাই মাসের শেষদিকে ২ নং আসামী মোয়াজ্জেম ১২ নং আসামী মানিক চৌধুরী ও ৭ নং সাক্ষী সাইদুর রহমানসহ মিঃ পি.এন. ওঝার সঙ্গে তার ঢাকাস্থ ধানমন্ডির পূর্বোক্ত বাড়িতে ষষ্ঠবারের মতো দেখা করেন। পি.এন. ওঝার ২ নং আসামী মোয়াজ্জেমকে জানান যে, তিনি তখনও তার সরকারের পক্ষ থেকে আগরতলা বৈঠকের কোনো ফলাফল জানেন না। কিন্তু

তিনি চুপিসারে ১২ নং আসামী মানিক চৌধুরীকে জানিয়ে দেন যে, ভারতীয় কর্মকর্তারা এখানকার প্রতিনিধিদের যোগ্যতা ও বুদ্ধিমত্তায় আস্থাবান নন।

৯০. ঐ একই মাসে (জুলাই, ১৯৬৭) ৪ নং আসামী সুলতান করাচি সফর করেন। সেখানে ৩০ নং আসামী মাহবুব উদ্দিনের বাসায় ষড়যন্ত্রকারীদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ বাসায় ঠিকানা—১৪/৪ জি, মার্টিন কোয়ার্টারস, করাচি। নিম্নোক্তরা ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন :

১. সুলতান, আসামী নং ৪

২. মাহফিজ উল্লাহ, আসামী নং ৭

৩. জহুরুল হক, আসামী নং ১৭

৪. সার্জেন্ট শামসুল হক, আসামী নং ১২

৫. লেঃ রহমান, আসামী নং ৩১ এবং

৬. সিরাজ, সাক্ষী নং ১৫।

এছাড়া আরও তিন ব্যক্তি ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন যাদের নাম দেখা যায় পাইলট অফিসার মীর্জা, এস. এম. আলী এবং জয়নুল আবেদীন। এর মধ্যে শেষের দু'জনের পরিচয় উদ্ঘাটন করা যায় নি এবং প্রথমজন অসুস্থতাজনিত কারণে হাসপাতালে থাকায় চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যায় নি ।

৪ নং আসামী সুলতান ঐ সভায় বলেন যে, তিনি কিউবার বিপ্লব স্বচক্ষে দেখেছেন এবং ঐ ধরনের একটি বিপ্লবে নিজেকে উৎসর্গ করার জন্যেই তিনি বেঁচে আছেন। তিনি প্রধান প্রধান কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনার ঘাটতি দেখায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি এই বলে তার বক্তব্য শেষ করেন যে, এই সভায় উপস্থিত সকলে গ্রুপের লক্ষ্যে পৌছার জন্য, উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নিজ নিজ জীবন উৎসর্গ করার শপথ করুক।

৯১. এর সপ্তাহ দুয়েক পরে, ১৯৬৭ সালের জুলাই/আগস্ট মাসে ৩১ নং আসামী লেঃ রহমান ৩০ নং আসামী মাহবুব উদ্দিনের পূর্বোক্ত বাসায় আরেকটি সভা আহ্বান করেন। নিম্নোক্তরা ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন :

১. লেঃ রহমান, আসামী নং ৩১

২. লেঃ আবদুর রউফ, আসামী নং-৩৫

৩. জহুরুল হক, আসামী নং-১৭

৪. সুলতান, আসামী নং-৪

৫. মাহফিজ উল্লাহ, আসামী নং-৭

৬. বারি, আসামী নং-২২

৭. সিরাজ, সাক্ষী নং-১৫।

এছাড়াও উপস্থিতিদের মধ্যে দু'জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে—জয়নুল আবেদীন ও এম. এস. আলী বলে এবং আরও কয়েকজনের নাম রয়েছে অস্পষ্টভাবে লেখা। এদের কারোর পরিচয়ই উদ্ঘাটন করা যায় নি।

ঐ সভায় ৩১ নং আসামী লেঃ রহমান সদস্যদেরকে এই নির্দেশ দেন যে, ২ নং আসামী মোয়াজ্জেমের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানে সংগঠনের যে মূল অংশ কাজ করছে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগী হয়ে সবাই যেনো কাজ করেন। এরপর ৩৫ নং আসামী লেঃ আবদুর রউফ উপস্থিত সদস্যদেরকে বাংলায় শপথ বাক্য পাঠ করান। ঐ সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহও গ্রহণ করা হয় :

ক. ১৫নং সাক্ষী সিরাজুল ইসলাম মৌরিপুর এলাকা থেকে চাঁদা তুলবেন এবং সদস্য তালিকাভুক্তি করবেন

খ. ৭নং আসামী মাহফিজ উল্লাহ ড্রিগ রোড থেকে চাঁদা ও সদস্য সংগ্রহ করবেন।

গ. ১৭নং আসামী জহুরুল হক কোরাঙ্গী এলাকা থেকে চাঁদা ও সদস্য সংগ্রহ করবেন এবং ঐ একই উদ্দেশ্যে তিনি চাকলালা, পেশোয়ার, কোহাট সারগোদা সফর করবেন ।

৯২. ১৯৬৭ সালের আগস্ট মাসে ১২ নং আসামী মানিক চৌধুরী এবং ৭ নং সাক্ষী সাইদুর রহমান ঢাকা সফর করেন। তারা ৩ নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এরপরই তাদেরকে বলা হয় যে, তিনি স্টুয়ার্ড

মুজিব এবং ৩৩ নং আসামী রেজা আগরতলা গিয়েছিলেন। ৯৩. ১৯৬৭ সালের আগস্ট মাসে ৩৫ নং আসামী লেঃ আবদুর রউফ ২৯ নং আসামী জলিলের ক্লেটন কোয়ার্টার্সের বাসায় একটি জরুরি সভা আহ্বান করেন। নিম্নোক্তরা ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন :

১. মাহফিজ উল্লাহ, আসামী নং ৭

২. বারি, আসামী নং ২২

৩. জলিল, আসামী নং ২৯

৪. লেঃ রহমান, আসামী নং ৩১

৫. লেঃ রউফ, আসামী নং ৩৫

৬. শামসুদ্দিন, সাক্ষী নং ৬ এবং

৭. সিরাজ, সাক্ষী নং ১৫।

এই সভায় উপস্থিতদের মধ্যে আরও তিনজনের নাম দেখা যায় – ক্যাপ্টেন আফতাব চৌধুরী, জয়নুল আবেদীন এবং সিদ্দিকুর রহমান। কিন্তু এদের পরিচয় উদ্ঘাটন করা যায় নি।

এই সভায় ৩৫ নং আসামী লেঃ রউফ এবং ৩১ নং আসামী লেঃ রহমান কতগুলো আশঙ্কাজনক প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তাদের সন্দেহ যে, তারা সন্দেহভাজন হিসেবে কড়া নজরের মধ্যে আছেন। ৩৫ নং আসামী লেঃ রউফ সভায় অংশগ্রহণকারীদেরকে আর কোনো নতুন সদস্য সংগ্রহ না করার নির্দেশ দেন। তিনি গ্রুপের সদস্যদেরকে ছুটি নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে যাবার উদ্যোগ নিতে বলেন। ফলে, গ্রুপের সদস্যরা ছুটি নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে তাদের নিজস্ব শহরগুলোতে চলে যেতে থাকে।

৯৪. ৩ নং আসামী সার্জেন্ট শামসুল হকের পরামর্শে ১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসের কোনো এক সময় ১৭ নং আসামী জহুরুল হক চাকলালা পি.এ.এফ. স্টেশন পরিদর্শন করেন এবং সেখানে তিনি ২১ নং সাক্ষী সার্জেন্ট রজব হোসেনের সাক্ষাৎ পান। ১৭ নং আসামী জহুরুল হক ২১ নং সাক্ষী রজব হোসেনকে জানান যে, সামরিক বিদ্রোহের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য একটি গ্রুপ গঠিত হয়েছে। তিনি ২১নং সাক্ষী রজব হোসেনকে

সেই গ্রুপে যোগদানের আহ্বান জানান। কিন্তু ২১ নং সাক্ষী রজব হোসেন এই ধরনের ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ডে নিজেকে যুক্ত করতে অস্বীকার করেন। ৯৫. ১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাসে ৩৩ নং আসামী রেজা ১২ নং সাক্ষী রমিজের কাছ থেকে পি.আই.এ'র একটি ক্রেডিট টিকিট পান এবং এর মাধ্যমে ১০ নং আসামী রুহুল কুদ্দুস ও ২৫ নং আসামী ক্যাপ্টেন মোতালেবকে একথা জানাতে লাহোর-পেশোয়ার যাত্রা করেন যে, তার মনে হয় ২ নং আসামী মোয়াজ্জেম সংগঠনের তহবিল ব্যবহারে অনিয়ম করছেন। উল্লেখ, ইতোমধ্যে ১০ নং আসামী রুহুল কুদ্দুস এবং ২৫ নং আসামী ক্যাপ্টেন মোতালেব যথাক্রমে লাহোর ও পেশোয়ারে পোস্টিং পেয়ে চলে গিয়েছেন।

৯৬. ১৯৬৭ সালের নভেম্বরে ১৫ নং সাক্ষী সিরাজ 'প্রিভিলেজ লিভ'-এ ঢাকা যান। ঠিক ঐ সময়ই ৩০ নং আসামী মাহবুব উদ্দিন, ৩৫ নং আসামী লেঃ রউফ এবং ৩১ নং আসামী লেঃ রহমানও ছুটিতে ঢাকা পৌঁছেন।

৯৭. ১৯৬৭ সালের নভেম্বরে নিম্নোক্ত ষড়যন্ত্রকারীরা ২৪ নং সাক্ষী প্রাক্তন স্কোয়াড্রন লিডার মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরীর বাসায় একটি সভায় মিলিত হন :

১. ফজলুল হক, আসামী নং ১১

২. এম. এ. রাজ্জাক, আসামী নং ১৬

৩. কর্পোরাল জামাল, সাক্ষী নং ১৪

৪. জাকির আহমদ, সাক্ষী নং ২২

৫. সার্জেন্ট এম. আবদুল হালিম, সাক্ষী নং ২৩ এবং

৬. চৌধুরী, সাক্ষী নং ২৪ ।

এই সভায় আলোচনা হয় যে, ২ নং আসামী মোয়াজ্জেম এবং তার অনুসারী ব্যক্তিবর্গের স্বার্থপরতার কারণে গ্রুপের যে দুরবস্থা হয়েছে সেখান থেকে গ্রুপকে উদ্ধার করে এর কাজকর্ম পুনরুজ্জীবিত করা দরকার।

৯৮. ১৯৬৭ সালের নভেম্বরে ২২নং সাক্ষী জাকির ২৫ নং সাক্ষী উইং কমান্ডার আশফাক মিয়াকে জানান যে, কয়েকদিন আগে ২৩ নং সাক্ষী হালিম তাকে ২৪নং সাক্ষী চৌধুরীর বাসায় নিয়ে গিয়েছিলেন ও সেখানে তিনি নিম্নোক্ত

ব্যক্তিদেরকে সমবেত দেখেছেন :

১. ফজলুল হক, আসামী নং ১১

২. এম.এ. রাজ্জাক, আসামী নং ১৬

৩. চৌধুরী, সাক্ষী নং ২৪

৪. কর্পোরাল জামাল, সাক্ষী নং ১৪ এবং

৫. হালিম, সাক্ষী নং ২৩ ।

২২নং সাক্ষী জাকির ২৫নং সাক্ষী আশফাক খানের নিকট অভিযোগ করেন যে, উপরোল্লেখিত ব্যক্তিরা কেন্দ্র থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে আলাদা করার বিষয়ে কথাবার্তা বলছিলেন । ৯৯. ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে ১৫ নং সাক্ষী সিরাজের বন্ধু জনৈক মিঃ

মালিকের ঢাকাস্থ শুক্রাবাদের বাসায় নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ একটি সভায় মিলিত হন : ১. লেঃ রউফ, আসামী নং ৩৫, ২. মাহবুব উদ্দিন, আসামী নং ৩০, ৩. সিরাজ, সাক্ষী নং ১৫ এবং আরো কয়েকজন যাদেরকে চিহ্নিত করা যায় নি।

এই সভায় গ্রুপের কর্মকাণ্ডকে আড়াল করে রাখার জন্য ঢাকায় একটি কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপনের বিষয়টি আলোচনা হয়। ৩৫ নং আসামী লেঃ রউফ গ্রুপের কাজকর্ম পুনরুজ্জীবিত করার জন্য ২ নং আসামী মোয়াজ্জেম এবং কর্নেল এম.এ.জি ওসমানীর সঙ্গে যোগাযোগ করার উদ্যোগ নেন।

১০০. এর অল্প কয়েকদিন পরেই ষড়যন্ত্রকারী গ্রুপের সদস্যদের গ্রেফতার করা আরম্ভ হয় এবং এইভাবে তাদের কর্মকাণ্ড সমাপ্ত হয়।

এখন যথাবিহিত সম্মানপূর্বক প্রার্থনা এই যে, আসামীদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে এবং এখানে তা সন্নিবেশিত হয়েছে, তার ভিত্তিতে আসামীদের যেনো বিচার করা হয়।

পরিশিষ্ট-২

শেখ মুজিবের জবানবন্দী

স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতীয় ও বঙ্গীয় মুসলিম লীগের একজন সক্রিয় সদস্য হিসাবে আমার বিদ্যালয় জীবনের সূচনা হইতেই আমি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলসভাবে সংগ্রাম করিয়াছি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এই সংগ্রামে আমাকে আমার লেখাপড়া পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হইয়াছে ।

স্বাধীনতা লাভের পর মুসলিম লীগ পাকিস্তানের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, এর ফলে, ১৯৪৯ সালে আমরা মরহুম জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ গঠন করি। আওয়ামী লীগ পূর্বেও ছিলো এবং এখনও সেইরূপ একটি নিয়মতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিদ্যমান ।

১৯৫৪ সালে আমি প্রথমে প্রাদেশিক পরিষদে এবং পরে জাতীয় বিধান সভায় সদস্য নির্বাচিত হই । আমি দুইবার পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রিত্ব লাভ করি। অধিকন্তু আমি গণচীনে প্রেরিত বিধান পরিষদের এক প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করি। জনসাধারণের কল্যাণার্থে একটি নিয়মতান্ত্রিক বিরোধীদল গঠন করার জন্য আমাকে ইতিমধ্যে কয়েক বৎসর কারা নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিলো।

সামরিক শাসন প্রবর্তনের পর হইতেই বর্তমান সরকার আমার উপর নির্যাতন চালাইতে থাকে। ১৯৫৮ সালের ১২ই অক্টোবর তাহারা পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সে আমাকে গ্রেফতার করে এবং প্রায় দেড় বৎসরকাল বিনা বিচারে আটক রাখে । আমাকে এইভাবে আটক রাখাকালে তাহারা আমার বিরুদ্ধে ছয়টি ফৌজদারি মামলা দায়ের করে, কিন্তু আমি ঐ সকল অভিযোগ হইতে সসম্মানে অব্যাহতি লাভ করি। ১৯৫১-এর ডিসেম্বর কিংবা ১৯৬০-এর জানুয়ারিতে আমাকে উক্ত আটকাবস্থা হইতে মুক্তি দেওয়া হয়।

মুক্তিলাভকালে আমার উপর কিছু কিছু বিধিনিষেধ জারি করা হয়—যেমন : ঢাকা ত্যাগ করিলে আমাকে গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে লিখিতভাবে স্পেশাল ব্রাঞ্চকে জানাইতে হইবে এবং প্রত্যাবর্তনের পরেও একইভাবে সে বিষয় তাহাদিগকে অবগত করাইতে হইবে। গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা এই সময় সর্বদা ছায়ার

মতো আমার পিছু লাগিয়া থাকিত ।

অতঃপর ১৯৬২ সালে বর্তমান শাসনতন্ত্র জারির প্রাক্কালে যখন আমার নেতা মরহুম শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হয়, তখন আমাকেও জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স বলে কারান্তরালে নিক্ষেপ করা হয় এবং প্রায় ছয় মাস বিনা বিচারে আটক রাখা হয়। জনাব সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর ১৯৬৪ সালে দেশের উভয় অংশে আওয়ামী লীগকে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে পুনরুজ্জীবিত করা হয় এবং আমরা সম্মিলিত বিরোধী দলের অঙ্গদল হিসাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। সম্মিলিত বিরোধীদল এই সময় প্রেসিডেন্ট পদে জনাব আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহকে মনোনয়ন দান করে। আমরা নির্বাচনী অভিযান শুরু করি। সরকারী কর্তৃপক্ষও পুনরায় আমার বক্তৃতা সম্পর্কে কয়েকটি মামলা দায়ের করিয়া আমাকে মিথ্যা বিরক্ত ও লাঞ্ছিত করিতে থাকে ।

১৯৬৫ সালে ভারতের সাথে যুদ্ধ চলাকালে যে সকল রাজনীতিবিদ ভারতীয় আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেন আমি তাহাদের অন্যতম। সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে পূর্ণভাবে সমর্থন করার জন্য আমি আমার দল ও জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানাই যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য প্রদান করার জন্যও আমার দল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ইহার সকল অঙ্গের নিকট নির্দেশ প্রেরণ করে।

যুদ্ধ চলাকালে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের বাসভবনে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মেলনে আমি প্রদেশের অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে এক যুক্ত বিবৃতিতে ভারতীয় আক্রমণের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করি এবং দেশের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম ও সাহায্য করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আবেদন জানাই। যুদ্ধাবসানে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের প্রদেশ ভ্রমণকালে আমি ও অন্যান্য রাজনীতিবিদগণ আমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি। সেই সময় আমি পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান ও যুদ্ধকালে আমাদের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এপ্রদেশকে সামরিক প্রতিরক্ষার ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য প্রেসিডেন্টের নিকট আবেদন জানাই। কারণ যুদ্ধকালে পূর্ব পাকিস্তান দেশের অন্য অংশসহ বিশ্ব হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলো ।

আমি তাসখন্দ ঘোষণাকেও সমর্থন করিয়াছিলাম। কারণ আমি এবং আমার প্রতিষ্ঠান অগ্রগতির জন্য বিশ্বশান্তিতে আস্থাবান—আমরা বিশ্বাস করি যে, সকল আন্তর্জাতিক বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসা হওয়া উচিত।

১৯৬৬ সালের গোড়ার দিকে লাহোরে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় জাতীয় সম্মিলনের বিষয় নির্বাচনী কমিটির নিকট আমি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্যাবলীর নিয়মতান্ত্রিক সমাধান—ছয় দফা কর্মসূচি উপস্থিত করি। ছয় দফা কর্মসূচিতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান—উভয় অংশের জন্যই পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি করা হইয়াছে ।

অতঃপর আমার প্রতিষ্ঠান পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ছয় দফা কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং দেশের উভয় অংশের মধ্যকার অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বৈষম্য দূরীকরণের অনুকূলে জনমত যাচাই ও গঠনের জন্য ছয় দফার পক্ষে জনসভা অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়।

ইহাতে প্রেসিডেন্টসহ অন্যান্য সরকারী নেতৃবৃন্দ ও সরকারী প্রশাসনযন্ত্র আমাকে 'অস্ত্রের ভাষায়' 'গৃহ যুদ্ধ' ইত্যাদি হুমকি প্রদান করে এবং একযোগে এক ডজনেরও অধিক মামলা দায়ের করিয়া আমাকে হয়রানি করিতে শুরু করে। ১৯৬৬ সালের এপ্রিলে আমি যখন খুলনায় একটি জনসভা করিয়া যশোর হইয়া ঢাকা ফিরিতেছিলাম তখন তাহারা যশোরে আমার পথরোধ করে এবং আপত্তিকর বক্তৃতা প্রদানের অভিযোগে ঢাকা হইতে প্রেরিত এক গ্রেফতারী পরোয়ানা-বলে এইবারের মতো প্রথম গ্রেফতার করে।

আমাকে যশোরের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করা হইলে তিনি আমাকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন প্রদান করেন। আমি ঢাকার সদর দক্ষিণ মহকুমা প্রশাসকের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি আমার জামিনে অসম্মত হন, কিন্তু মাননীয় দায়রা জজ প্রদত্ত জামিন বলে আমি সেই দিনই মুক্তি পাই এবং সন্ধ্যা সাতটায় নিজগৃহে গমন করি। সেই সন্ধ্যায়ই আটটায়, পুলিশ পুনরায় আপত্তিকর বলিয়া কথিত এক বক্তৃতার উপর সিলেট হইতে প্রেরিত এক গ্রেফতারী পরোয়ানা বলে আমার বাসগৃহ হইতে আমাকে গ্রেফতার করে। পুলিশ সেই রাত্রেই আমাকে সিলেট লইয়া যায়। পরদিন প্রাতে আমাকে আদালতে উপস্থিত করা হইলে সিলেটের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট আমার জামিনের আবেদন বাতিল করিয়া আমাকে কারাগারে প্রেরণ করেন। পরদিবস সিলেটের মাননীয় দায়রা জজ আমার জামিন প্রদান করেন। কিন্তু

মুক্ত হইবার পূর্বেই পুলিশ পুনরায় আপত্তিকর বলিয়া কথিত এক বক্তৃতা প্রদানের অভিযোগে আমাকে কারা দরজায়ই গ্রেফতার করে। এবারের গ্রেফতারী পরোয়ানা মোমেনশাহী হইতে প্রেরিত হইয়াছিলো। সেই রাত্রে আমাকে পুলিশ পাহারাধীনে মোমেনশাহী লইয়া যাওয়া হয় এবং একইভাবে মোমেনশাহীর মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট আমার জামিন প্রদানে অস্বীকৃত হন এবং পরে মাননীয় দায়রা জজ প্রদত্ত জামিনে মুক্তিলাভ করিয়া ঢাকা প্রত্যাবর্তন করি। উপরিউক্ত সকল ধারাবাহিক গ্রেফতারী প্রহসন ও হয়রানি ১৯৬৬ সালের এপ্রিলে সংঘটিত হয়।

১৯৬৬ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে—সম্ভবত আটই যে, আমি নারায়ণগঞ্জে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রদান করি এবং রাত্রে ঢাকায় নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন করি। রাত একটার সময় পুলিশ 'ডিফেন্স অফ পাকিস্তান রুল'-এর ৩২ ধারায় আমাকে গ্রেফতার করে। একই সঙ্গে আমার প্রতিষ্ঠানের বহুসংখ্যক নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হয়। ইহাদের মধ্যে ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দীন আহাম্মদ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি খোন্দকার মুশতাক আহাম্মদ, প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব মুজিবর রহমান, চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব আজিজ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের শ্রম সম্পাদক জনাব জহুর আহাম্মদ চৌধুরীসহ বহু নেতৃবৃন্দ। ইহার অল্প কয়েকদিন পরে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী, এম. এন. এ, প্রচার সম্পাদক জনাব মোমেন এডভোকেট, সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব ওবায়দুর রহমান, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব শামসুল হক, ঢাকা শহর আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য মোল্লা জালালউদ্দিন আহম্মদ এডভোকেট, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি ও প্রাক্তন মন্ত্রী ক্যাপটেন মনসুর আলী, প্রাক্তন এম. এন. এ. জনাব আমজাদ হোসেন, এডভোকেট জনাব আমিনুদ্দিন আহম্মদ, পাবনার এডভোকেট জনাব আমজাদ হোসেন, নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব মুস্তফা সারওয়ার, নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব মহীউদ্দিন আহম্মদ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কার্যালয় সম্পাদক জনাব মোহাম্মদুল্লাহ এডভোকেট ও সংগ্রামী নেতা শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয় সম্পাদক জনাব সিরাজউদ্দিন আহম্মদ, রাজারবাগ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি

জনাব হারুনুর রশীদ, তেজগাঁও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব শাহাবুদ্দীন চৌধুরী, ঢাকা সদর উত্তর আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব আবদুল হাকিম, ধানমন্ডি আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি জনাব রশীদ মোশারফ, শহর আওয়ামী লীগ কার্যালয় সম্পাদক জনাব সুলতান আহাম্মদ, অন্যতম আওয়ামী লীগ কর্মী জনাব নূরুল ইসলাম, চট্টগ্রাম শহর আওয়ামী লীগ অস্থায়ী সম্পাদক জনাব আবদুল মান্নান, পাবনার এডভোকেট জনাব হাসনাইন, মোমেনশাহীর অন্যতম আওয়ামী লীগ কর্মী জনাব আবদুর রহমান সিদ্দিকীসহ অন্যান্য বহু আওয়ামী লীগ কর্মী, ছাত্রনেতা ও শ্রমিক নেতাকে পাকিস্তান রক্ষা বিধি ৩২ ধারা (নিষ্ঠুর অত্যাচার) বলে কারান্তরালে নিক্ষেপ করা হয়। আমার দুই ভাগিনেয়—পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক শেখ ফজলুল হক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শেখ শহীদুলকে কারারুদ্ধ করা হয়। অধিকন্তু পূর্ব পাকিস্তানের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বাংলা দৈনিক ইত্তেফাককেও বর্তমান শাসকগোষ্ঠী নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ইহার একমাত্র কারণ হইল যে, ইত্তেফাক মাঝে মাঝে আমার প্রতিষ্ঠানের নীতিসমূহ সমর্থন করিত। সরকার ইহার ছাপাখানা বাজেয়াফত করে এবং ইহার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সম্পাদক জনাব তোফাজ্জল হোসেন ওরফে মানিক মিয়াকে দীর্ঘকালের জন্য কারারুদ্ধ রাখিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি ফৌজদারি মামলা দায়ের করে। যুগপৎ চট্টগ্রাম মুসলিম চেম্বার অব কমার্সের প্রাক্তন সভাপতি, চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রাস্টের প্রাক্তন সহ-সভাপতি ও অন্যতম আওয়ামী লীগ নেতা জনাব ইদ্রিসকেও পাকিস্তান রক্ষা বিধি বলে অন্ধ কারাকক্ষে নিক্ষেপ করা হয়।

আমাদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে আমার প্রতিষ্ঠান ১৯৬৬ সালের ৭ই জুন সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে। প্রদেশব্যাপী এই হরতালের দিন পুলিশের গুলিতে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে ১১ ব্যক্তি নিহত হয়। পুলিশ প্রায় ৮০০ লোককে গ্রেফতার করে এবং অসংখ্য লোকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর জনাব মোনেম খান প্রায়শই তাঁহার লোকজন এবং সরকারী কর্মচারী সমক্ষে উন্মুক্তভাবে বলিয়া থাকেন যে, যতোদিন তিনি গদিতে আসীন থাকিবেন ততোদিন শেখ মুজিবকে শৃঙ্খলিত থাকিতে হইবে। ইহা অনেকেই অবগত আছেন । আটকাবস্থায় কারাকক্ষেই আমাকে বেশ কয়েকবার বিচারালয়ের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে । প্রায় ২১ মাস আটক রাখিবার পর ১৯৬৮ সালের জানুয়ারির ১৭/১৮ তারিখ রাত একটার সময় আমাকে তথাকথিত মুক্তি দেওয়া হয় এবং কেন্দ্রীয় কারাগারের ফটক হইতে

কতিপয় সামরিক ব্যক্তি দৈহিক বল প্রয়োগ করিয়া আমাকে ঢাকা সেনানিবাসে লইয়া আসে এবং একটি রুদ্ধ কক্ষে আটক রাখে। আমাকে বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নির্জনে রাখা হয় এবং কাহারও সহিত সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ করা হয়। আমাকে খবরের কাগজ পর্যন্ত পড়িতে দেওয়া হইত না। বিশ্ব হইতে সকল যোগাযোগবিহীন অবস্থায় এইভাবে আমাকে দীর্ঘ পাঁচ মাসকাল আটক থাকিতে হয়। এই সময় আমাকে অমানুষিক মানসিক নির্যাতন সহ্য করিতে হয় এবং আমাকে সকল প্রকার দৈহিক সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত রাখা হয়। এই মানসিক অত্যাচার সম্বন্ধে যতো অল্প প্রকাশ করিতে হয় ততোই উত্তম।

এই বিচার কার্য শুরু হইবার মাত্র একদিন পূর্বে, ১৯৬৮ সালের ১৮ই জুন, আমি প্রথম এডভোকেট জনাব আবদুস সালাম খানের সহিত সাক্ষাৎ করি এবং তাহাকে আমার অন্যতম কৌসুলি নিয়োগ করি।

কেবলমাত্র আমার উপর নির্যাতন চালাইবার জন্য এবং আমার দলকে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও আমাদিগকে কুখ্যাত করিবার জঘন্য মনোবৃত্তি লইয়া আমাকে এই তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলায় মিথ্যা জড়িত করা হইয়াছে। ছয় দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিসহ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, চাকরির সংখ্যা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সমতার ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়ের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করা ও নিষ্পেষণ করাই ইহার মূল উদ্দেশ্য ।

এই আদালতে আসিবার পূর্বে আমি লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, লেঃ মোজাম্মেল হোসেন, এক্স-কর্পোরাল আমির হোসেন, এল এস সুলতান উদ্দিন আহাম্মদ, কামালউদ্দিন আহাম্মদ, স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, ফ্লাইট সার্জেন্ট মাহফুজ উল্লাহ ও এই মামলায় জড়িত অন্যান্য স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী কর্মচারীদের কখনও দেখি নাই। জনাব আহমদ ফজলুর রহমান, জনাব রুহুল কুদ্দুস ও জনাব খান মোহাম্মদ শামসুর রহমান—এই তিনজন সি.এস.পি অফিসারকে আমি জানি। আমি মন্ত্রী হিসাবে সরকারী কার্য সম্পাদনকালে তাঁহাদিগকে জানিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম এবং তাঁহারাও তখন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের বিভিন্ন দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু আমি তাঁহাদের সঙ্গে কখনো রাজনীতি বিষয়ক আলোচনা করি নাই কিংবা কোনো ষড়যন্ত্রেও ব্যাপৃত হই নাই। আমি কোনোদিন লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের বাসগৃহে অথবা করাচীতে জনাব কামালউদ্দিনের বাসগৃহে গমন করি নাই কিংবা আমার অথবা লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের অথবা করাচীতে জনাব কামালউদ্দিনের বাসগৃহে কোনো

সভাও অনুষ্ঠিত হয় নাই কিংবা এই তথাকথিত ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কোনো ব্যক্তির সহিত কোনো আলোচনা আমার অথবা জনাব তাজুদ্দীনের বাসায় সংঘটিত হয় নাই। ঐ সকল ব্যক্তি কোনোদিন আমার গৃহে গমন করে নাই এবং আমিও এই তথাকথিত ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত কাহাকেও টাকা দিই নাই। আমি কখনও ডাঃ সাঈদুর রহমান কিংবা মানিক চৌধুরীকে এই তথাকথিত ষড়যন্ত্রে সাহায্য করিতে বলি নাই। তাঁহারা চট্টগ্রামে আমার প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য শত শত কর্মীদের ন্যায় মাত্র। আমার প্রতিষ্ঠানে তিনজন সহ-সভাপতি, ৪৪ জন কার্যকরী পরিষদ সদস্য, একজন সাধারণ সম্পাদক এবং আটজন সম্পাদক রহিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কর্মকর্তাদের অনেকেই প্রাক্তন মন্ত্রী, এম.এন.এ ও এম.পি.এ। বর্তমান কেন্দ্রীয় পরিষদের পাঁচজন ও প্রাদেশিক পরিষদের দশজন সদস্য আমার প্রতিষ্ঠানভুক্ত। চট্টগ্রামেও আমার প্রতিষ্ঠানের জেলা ও শহর সভাপতি ও সম্পাদকগণ; প্রাক্তন এম.এন.এ এম.পি.এ ও অনেক বিত্তশালী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ বিদ্যমান। আমি তাহাদের কাহারও নিকট কোনো প্রকার সাহায্যের কথা উল্লেখ করি নাই। ইহা অসম্ভব যে, আমি একজন সাধারণ ব্যবসায়ী মানিক চৌধুরী ও একজন সাধারণ এল. এম. এফ. ডাক্তার সাঈদুর রহমানকে কোনো সাহায্যের জন্য অনুরোধ করিতে পারি। ১৯৬৫ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী জনাব জহুর আহাম্মদ চৌধুরীর বিরোধিতা করিবার জন্য ডাঃ সাঈদুর রহমানকে বরং আওয়ামী লীগ হইতে বহিষ্কার করা হইয়াছিলো। আমি ডাঃ সাইদুর রহমানের গৃহে কদাপি গমন করি নাই।

আমি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি। ইহা একটি নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল—দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যাহার একটি সুনির্দিষ্ট, সুসংগঠিত নীতি ও কর্মসূচি রহিয়াছে। আমি অনিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে কদাপি আস্থাশীল নই। আমি দেশের উভয় অংশের জন্য ন্যায়বিচার চাহিয়াছিলাম — ছয় দফা কর্মসূচিতে ইহাই বিধৃত হইয়াছে। দেশের জন্য আমি যাহাই মঙ্গলকর ভাবিয়াছি আমি সর্বদাই তাহা নিয়মতান্ত্রিক গণ্ডির ভিতরে জনসমক্ষে প্রকাশ করিয়াছি এবং এই নিমিত্ত আমাকে সর্বদাই শাসকগোষ্ঠী এবং স্বার্থবাদীদের হাতে নিগৃহীত হইতে হইয়াছে। তাহারা আমাকে ও আমার প্রতিষ্ঠানকে দমন করিয়া পাকিস্তানের জনগণের বিশেষত পূর্ব পাকিস্তানিদের উপর শোষণ ও নিষ্পেষণ অব্যাহত রাখিতে চায় ।

আমার উক্তির সমর্থনে আমি মহামান্য আদালতে আরো নিবেদন করিতে

চাই যে, আমাকে প্রতিহিংসাবশত মিথ্যা এই মামলায় জড়িত করা হইয়াছে। পাকিস্তান সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগ কর্তৃক ১৯৬৮ সালের ৬ই জানুয়ারি প্রকাশিত এক প্রচারপত্রে অভিযুক্ত বলিয়া কথিত ২৮ ব্যক্তির নাম লিপিবদ্ধ ছিলো এবং উহার মধ্যে আমার নাম ছিলো না। উক্ত প্রচারপত্রে ইহাও উল্লেখ হইয়াছিলো যে, সকল অভিযুক্তই অভিযোগ স্বীকার করিয়াছে—তদন্ত প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে—এবং শীঘ্রই বিষয়টি বিচারার্থে আদালতে প্রেরণ করা হইবে।

একজন প্রাক্তন মন্ত্রী হিসাবে অর্জিত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে আমি স্বরাষ্ট্র বিভাগের উক্ত প্রচারপত্র সম্বন্ধে একথা জানাইতে চাই যে, সংশ্লিষ্ট বিভাগের সেক্রেটারী কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে দলিলপত্র পরীক্ষিত ও অনুমোদিত হওয়া ব্যতিরেকে কোনো বিভাগ হইতে কোনো প্রকার প্রচারপত্র প্রকাশ করা যায় না। এবং এবংবিধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে কোনো প্রচারপত্র প্রকাশ করিতে হইলে প্রধানমন্ত্রী অথবা প্রেসিডেন্টের অনুমোদন লাভ আবশ্যক ।

বর্তমান মামলা উল্লিখিত নিষ্পেষণ ও নির্যাতন নীতির পরিণতি ছাড়া আর কিছুই নয়। অধিকন্তু স্বার্থবাদী মহল কর্তৃক শোষণ অব্যাহত রাখার যে ষড়যন্ত্রজাল বর্তমান শাসকগোষ্ঠী বিস্তার করিয়াছে এই মামলা তাহারই বিষময় প্রতিক্রিয়া। আমি কখনও পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য কোনো কিছু করি নাই কিংবা কোনোদিনও এই উদ্দেশ্যে কোনো স্থল, নৌ বা বিমান বাহিনীর কোনো কর্মচারীর সংস্পর্শে কোনো ষড়যন্ত্রমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করি নাই ।

আমি নির্দোষ এবং এ ব্যাপারে পরিপূর্ণরূপে অজ্ঞ। তথাকথিত ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না ।

পরিশিষ্ট-৩

অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নামের তালিকা

১. শেখ মুজিবুর রহমান

ক. গ্রাম: টুঙ্গিপাড়া, থানা: গোপালগঞ্জ জেলা: ফরিদপুর।

খ. ৬৭৭ ধানমন্ডি আ/এ, সড়ক ৩২, ঢাকা ।

২. পি নং-৫৭৪, লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন

গ্রাম-ধুসরতাল, থানা-পিরোজপুর জেলা-বরিশাল।

৩. ও নং-৬৬৫০৮ স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান

গ্রাম-ঘাটমাঝি, থানা-মাদারীপুর জেলা-ফরিদপুর ।

৪. প্রাক্তন এল/ এস,সুলতান উদ্দিন আহমেদ

গ্রাম-উত্তর খামার, থানা-কাপাসিয়া, জেলা-ঢাকা

৫. ও নং-৬৪৬৭২ এল/এস সি ডি আই নূর মোহাম্মদ

ক. গ্রাম-কুমারবাগ,থানা-লৌহজং তহশিল-হালিদিয়া, জেলা-ঢাকা

খ. ৭৩ ধানমন্ডি আ/এ, সড়ক ৩০, ঢাকা।

৬.আহমেদ ফজলুর রহমান সি এস পি

গ্রাম-কাচিশার, থানা-দেবীদ্বার জেলা-কুমিল্লা

৭. পাক/৫১৩০১, এফ সার্জেন্ট মাহফিজ উল্লাহ

গ্রাম-মুরাদপুর, থানা- বেগমগঞ্জ জেলা-নোয়াখালী ।

৮. প্রাক্তন কর্পোরাল আবুল বাশার মোহাম্মদ মঠবাড়িয়া আবদুস সামাদ

গ্রাম-মিঠাখালী, জেলা-বরিশাল ।

৯. প্রাক্তন হাবিলদার দলিল উদ্দিন

গ্রাম-শ্যামপুর, থানা-বাকেরগঞ্জ জেলা-বরিশাল ।

১০. রুহুল কুদ্দুস সি এস পি

ক. গ্রাম-পাঁচরিখি, থানা- সাতক্ষীরা জেলা-খুলনা ।

খ. ৬১৮-এ ধানমন্ডি আ/এ, সড়ক ১৮, ঢাকা ।

১১. পাক/৭২৮৭০, ফ্লাইট সার্জেন্ট মুহম্মদ ফজলুল হক

গ্রাম-শায়েস্তাবাদ থানা-কোতোয়ালী জেলা-বরিশাল ।

১২. ভূপতিভূষণ চৌধুরী ওরফে মানিক চৌধুরী

গ্রাম-হবিলাল দ্বীপ, থানা- পটিয়া জেলা-চট্টগ্রাম এবং ৪১, রামজয় মহাজন লেন, চট্টগ্রাম ।

১৩. বিধান কৃষ্ণ সেন

গ্রাম-সারোয়াতলা, থানা-বোয়ালখালী, জেলা-চট্টগ্রাম ।

১৪. পি.জে. ও ২০৬৮, সুবেদার আবদুর রাজ্জাক

গ্রাম-দক্ষিণ ভরসার, থানা-মতলব জেলা-কুমিল্লা ।

১৫. প্রাক্তন হাবিলদার ক্লাক মুজিবুর রহমান ই পি আর টি সি

গ্রাম-গোপালপুর, থানা-নবীনগর জেলা-কুমিল্লা

১৬. প্রাক্তন ফ্লাইট সার্জেন্ট মুহম্মদ আবদুর রাজ্জাক

গ্রাম-বাঞ্ছারামপুর, থানা-দাউদকান্দি জেলা-কুমিল্লা ।

১৭. পাক/৭২৩২৪, সার্জেন্ট জহরুল হক

গ্রাম-সোনাপুর, থানা-সুধারাম জেলা-নোয়াখালী ।

১৮. প্রাক্তন এ/বি মুহম্মদ খুরশীদ

সাবের কটেজ,কোতোয়ালী, ফরিদপুর।

১৯. খান শামসুর রহমান

গ্রাম-লামুবাড়ি,থানা-মানিকগঞ্জ জেলা- ঢাকা।

২০. পি.জে.ও ৭৬৮, রিসালদার এ. কে. এম. শামসুল হক

গ্রাম-পুতাল ডাকঘর-লামুবাড়ি থানা-মানিকগঞ্জ, জেলা-ঢাকা ।

২১. নং ৩০৩১০১৮ হাবিলদার আজিজুল হক

গ্রাম-কাচিয়া, থানা-গৌড়নদী জেলা-বরিশাল।

২২. পাক/ ৭৩০৪০, এস এ সি মাহফুজুল বারী

গ্রাম-চরলক্ষ্মী, থানা-রামগতি জেলা-নোয়াখালী ।

২৩. পাক/৭০৪১৫, সার্জেন্ট শামসুল হক

গ্রাম-নৈরাজপুর, থানা- ফেনী জেলা-নোয়াখালী ।
২৪. পি এস এস-১০০৫২০ মেজর শামসুল আলম এ.এম.সি
১৬ খাজে দেওয়ান সেকেন্ড লেন, ঢাকা ।
২৫. পি এস এস-৬১০০, ক্যাপটেন মুহম্মদ আবদুল মোত্তালিব
গ্রাম-দারুনবাইরাতি,থানা- পূর্বধলা জেলা-ময়মনসিংহ।
২৬. পি টি সি-৫৭২৭, ক্যাপটেন এম. শওকত আলী মিয়া
গ্রাম-চকধা, থানা-নরিয়া জেলা-ফরিদপুর ।
২৭. পি এ-৬৫৬১, ক্যাপটেন খন্দকার নাজমুল হুদা এ. এস. সি
পশ্চিম বগুড়া রোড বরিশাল শহর জেলা-বরিশাল ।
২৮. ক্যাপটেন এ. এন. এম নূরুজ্জামান ইবিআর
গ্রাম-সাইদাবাদ, থানা-রায়পুরা জেলা-ঢাকা।
২৯. পাক /৭০৭০৪, সার্জেন্ট আবদুল জলিল
গ্রাম-সারাবাদ, থানা-নারায়ণপুর, ঢাকা ।
৩০. মুহম্মদ মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী
গ্রাম-পাইয়াম,ডাকঘর-চৈতিয়ান জেলা-সিলেট।
৩১. পি নং-৯৫৮, আই লেঃ এস. এম. এম. রহমান
গ্রাম-মাকরাইল, থানা-লোহাগড়া জেলা-যশোর।
৩২. এক্স সুবেদার এ. কে. এম. তাজুল ইসলাম
গ্রাম-শ্রীপুর থানা-ভান্ডারিয়া জেলা-বরিশাল ।
৩৩. মুহম্মদ আলী রেজা
গ্রাম-লাহিনি,থানা-কোতোয়ালী জেলা-কুষ্টিয়া ।
৩৪. পি এস এস-২০০৪৭১, ক্যাপটেন খুরশিদ উদ্দিন আহমেদ, এ. এম. সি
গ্রাম-বাঁশিয়া থানা-গফরগাঁও জেলা-ময়মনসিংহ ।
৩৫. পি নং-৯৪৪, আই লেঃ আবদুর রউফ
পাকিস্তান হাউজ থানা-ভৈরব জেলা-ময়মনসিংহ।

পরিশিষ্ট-৪

সরকার প্রদত্ত ছদ্মনামের তালিকা

ছদ্মনাম প্রকৃত ব্যক্তির নাম

পরশ শেখ মুজিবুর রহমান ১ নং আসামী

আলো লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন ২ নং আসামী

মুরাদ স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান ৩ নং আসামী

শেখর রুহুল কুদ্দুস, সি.এস.পি ১০ নং আসামী

কামাল প্রাক্তন এল/ এস সুলতান উদ্দিন আহমেদ ৪ নং আসামী

সবুজ এল/এস. নূর মোহাম্মদ ৫ নং আসামী

তুষার এ. এ. রহমান, সি.এস.পি ৬ নং আসামী

তুহিন ক্যাটারিং লেঃ মোজাম্মেল হোসেন ১ নং সাক্ষী

উল্কা মোঃ আমীর হোসেন মিয়া

পরিশিষ্ট-৫

কৌসুলিদের বিবরণী

কৌঁসুলি	অভিযুক্ত
টমাস উইলিয়মস কিউ.সি :	শেখ মুজিবুর রহমান
সহায়তাকারী	
আমীরুল ইসলাম	
মওদুদ আহমদ	
আবদুস সালাম খান :	শেখ মুজিবুর রহমান
সহায়তাকারী	লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেন
জহীরুদ্দিন	স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান
মশিউর রহমান	প্রাক্তন এল/এস সুলতানউদ্দিন আহমদ
মোল্লা জালালউদ্দিন	এল/এস নূর মোহাম্মদ
লমত আলী	খান আহমদ ফজলুর রহমান, সি.এস.পি
কে. জেড. আলম	সার্জেন্ট মাহফিজউল্লাহ
আমীরুল ইসলাম	প্রাক্তন করপোরাল আবুল বাসার
ভি.আই. চৌধুরী	মোঃ আবদুস সামাদ
শওকত হোসেন	প্রাক্তন হাবিলদার দলিল উদ্দিন
নূরুল আলম	ক্যাপ্টেন মোঃ আবদুল মোতালিব
মওদুদ আহমদ	সার্জেন্ট আবদুল জলিল
আবদুস সালাম	লেঃ এস.এস. রহমান

আবদুল হাই   মোঃ খুরশিদ

ময়নুল হোসেন   সুবেদার তাজুল ইসলাম

মীর হোসেন   সুবেদার আবদুর রাজ্জাক

সার্জেন্ট মোঃ আবদুর রাজ্জাক

ভূপতিভূষণ চৌধুরী

বিধানকৃষ্ণ সেন

হাবিলদার আজিজুল হক

মোঃ মাহবুবউদ্দিন চৌধুরী

প্রাক্তন হাবিলদার ক্লার্ক মুজিবুর রহমান

মোঃ আবদুল্লাহ   : ক্যাপ্টেন শওকত আলী মিয়া

আতাউর রহমান খান   : শামসুর রহমান সি.এস.পি

সহায়তাকারী   ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক

জমীরউদ্দিন   মোঃ আলী রেজা

খান বাহাদুর মোহাম্মদ ইসমাইল   : রুহুল কুদ্দুস, সি.এস.পি

সহায়তাকারী

আমিনুল হক

খান বাহাদুর নাজিরুদ্দিন আহমেদ   : মেজর শামসুল আলম

মীর্জা গোলাম হোসেন   : ক্যাপ্টেন নাজমুল হুদা ক্যাপ্টেন নূরুজ্জামান

জনাব হোসেন   : মাহফুজুল বারী

বদরুল হায়দার চৌধুরী   : সার্জেন্ট জহুরুল হক

রাষ্ট্রীয় কৌসুলি   : এ.কে.এম. শামসুল হক সার্জেন্ট শামসুল হক

পরিশিষ্ট-৬

সরকারি ক্ষমাপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ (রাজসাক্ষী)

১. লেঃ মোজাম্মেল হোসেন, পিতামৃত—মৌলভী মেনহাজ উদ্দিন মিয়া, পশ্চিম ফুলকি, থানা-বাসাইল, জেলা-ময়মনসিংহ।

২. প্রাক্তন কর্পোরাল মোহাম্মদ আমীর হোসেন মিয়া, পিতা-মৌলভী ফজিল মোল্লা, গ্রাম- রূপবাবুর চর, দাড়িকান্দি, থানা-জাজিরা, জেলা-ফরিদপুর ।

৩. সার্জেন্ট পাক/৫৪২৭২, শামসুদ্দিন আহমেদ, পিতা- মোঃ আফতাব উদ্দিন, গ্রাম- নিজকল্প, থানা-কোতোয়ালী, জেলা-ময়মনসিংহ ।

৪. ডঃ সাইদুর রহমান, পিতা-মৌলভী আবুল খায়ের চৌধুরী, গ্রাম-এনায়েত বাজার, থানা-কোতোয়ালী, জেলা-চট্টগ্রাম ।

৫. ফ্লাইট লেঃ মীর্জা মোহাম্মদ রমিজ, পিতা-এম.এম. সেরাজ, গ্রাম-ধনুন, থানা-রূপগঞ্জ, ঢাকা। বর্তমান ঠিকানা—৬০, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম ।

৬. ক্যাপ্টেন পি. এ/৬৬৩২, মোঃ আবদুল আলীম ভূঁইয়া, পিতা- আলহাজ্ব নিজাম উদ্দিন ভূঁইয়া, গ্রাম-পরমতলা, থানা-মুরাদনগর, জেলা-কুমিল্লা ।

৭. কর্পোরাল জামাল উদ্দিন আহমেদ, পিতা-বশীর উদ্দিন, গ্রাম-বিরামপুর, থানা- সুজানগর, জেলা- পাবনা ।

৮. পাক কর্পোরাল সিরাজুল ইসলাম, পিতা-মৌলভী আমিন উদ্দিন, গ্রাম-শিলাই, থানা- বুড়িচং, জেলা-কুমিল্লা ।

৯. মিঃ মোহাম্মদ গোলাম আহমেদ, পিতা-আবদুল জব্বার, গ্রাম-জাফরাবাদ, থানা- মাদারীপুর, জেলা-ফরিদপুর ।

১০. মিঃ আবুল বাশার মোহাম্মদ ইউসুফ, পিতা-মুন্সী মোহাম্মদ আলী হাওলাদার, গ্রাম- দক্ষিণ মিঠাখালী, থানা-মঠবাড়িয়া, জেলা-বরিশাল।

১১. সার্জেন্ট মোহাম্মদ আবদুল হালিম, পিতামৃত-মুন্সী আবদুল আজিজ, গ্রাম-সোহিলপুর, থানা-চান্দিনা, জেলা-কুমিল্লা

পরিশিষ্ট-৭

আগরতলায় শেখ মুজিব সম্পর্কে

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী

১৯৬৩ইং আমার ভাই MLA শ্রী উমেশলাল সিং সমভিব্যাহারে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে ১০ জন ত্রিপুরার পালম জিলার খোয়াই মহকুমা দিয়া আগরতলায় আমার আগরতলার বাংলোয় রাত্র ১২ ঘটিকায় আগমন করেন। প্রাথমিক আলাপ-আলোচনার পর আমার বাংলো বাড়ি হইতে মাইল দেড়েক দূরে ভগ্নী হেমাঙ্গিনী দেবীর বাড়িতে শেখ সাহেব আসেন। সেখানেই থাকার-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তারপর মুজিবুর ভাইয়ের প্রস্তাব অনুযায়ী আমি আমাদের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওয়াহের লাল নেহরুর সাথে দেখা করি। আমার সাথে ছিলেন শ্রী শ্রীরমন চীফ সেক্রেটারি। তাকে (শ্রীরমনকে) শ্রী ভান্ডারিয়ার বিদেশ সচিবের রুমে রাখিয়া প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করি। তিনি মুজিবুর রহমানকে ত্রিপুরায় থাকিয়া প্রচার করিতে সম্মত হন নাই। কারণ চীনের সাথে লড়াইয়ের পর এতোবড় ঝুঁকি নিতে রাজি হন নাই। তাই ১৫ দিন থাকার পর তিনি [শেখ মুজিব] ত্রিপুরা ত্যাগ করেন। সোনামুড়া পশ্চিম ত্রিপুরারই এক মহকুমা কুমিল্লার সাথে সংলগ্ন। শেখ মুজিব রহমানকে সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়।

শ্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী
ত্রিপুরা

(১৯৯১ সালে দিল্লিতে ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহের সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করেছিলাম মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক আমাদের প্রকাশিতব্য এক গ্রন্থে তাঁর একটি নিবন্ধের ব্যাপারে। তিনি তখন দিল্লিতে অবসরজীবন কাটাচ্ছেন, বয়সের কারণে স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে, চোখে দেখছেন কম, কিন্তু বাংলাদেশ নিয়ে হৃদয়াবেগে যুবকের মতোই টগবগে। কথা প্রসঙ্গে তিনি জানালেন চীন-ভারত যুদ্ধের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আগরতলা আগমনের কথা। তাঁর ধারণা ঐ সময় নতুন করে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুবের নিপীড়ন শুরু হয়েছিল। তখন একদিন আকস্মিকভাবেই সঙ্গী-সাথীসহ শেখ মুজিবুর রহমান আগরতলা উপস্থিত হন। শেখ মুজিব ও তাঁর প্রয়াত সহকর্মীদের স্মৃতিচারণকালে বারবারই অশ্রুসজল হয়ে ওঠেন শচীন্দ্রলাল সিংহ । আমাদের অনুরোধে আগরতলায় শেখ মুজিবের আগমনের সংক্ষিপ্ত ভাষ্য তিনি লিখে দিয়েছিলেন। কাঁপা কাঁপা হস্তাক্ষরে বেশ কষ্ট করে লেখা তাঁর এই বক্তব্য এখানেই প্রথমবারের মতো প্রকাশিত হলো। বয়োবৃদ্ধ শচীন্দ্রলাল সিংহের বক্তব্য একান্তই তাঁর নিজস্ব ।]

প্রকাশক